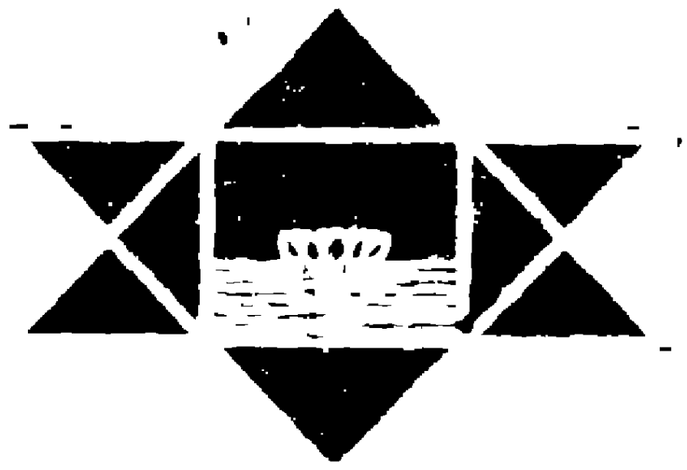

শ্রীঅরবিন্দ

যোগসমন্বয়

প্রথম ভাগ

(অবতরণিকা ও দিব্যকর্ম্মযোগ)

অনুবাদকের নিবেদন

শ্রীঅরবিন্দের মহাগ্রন্থ The Synthesis of Yoga (যোগসমন্বয়) ১৯১৪ সালের আগষ্ট হইতে ১৯২১ সালের জানুয়াবি পর্য্যন্ত প্রতি মাসে ধারাবাহিকরূপে "আর্য্য" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহার পর দিব্য কর্ম্ম-যোগ (The Yoga of Divine Works) নামক ইহার প্রথম ভাগ কতকটা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় ভাগের সর্ব্বাঙ্গীণ জ্ঞানযোগের (The Yoga of Integral Knowledge)— অধিকাংশ দেখিয়া সামান্য কিছু পবিবর্ত্তন করাও হয়। তাহার পর সমগ্র গ্রন্থখানি যখন পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হয় তখন দ্বাদশ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত দিব্য কর্ম্মযোগ নামক অংশের সহিত অতিমানস ও কর্ম্মযোগ নামক শ্রীঅরবিন্দেব একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ ত্রয়োদশ অধ্যাযরূপে সংযুক্ত কবা হয়।

যোগসম্বন্ধে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে শ্রীঅববিন্দের পূর্ণযোগের (Integral Yoga) কথা বিশেষ ও বিশদভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাহারা ইংরাজি ভাষা জানেন না অথবা যতটুকু জানেন তাহাতে শ্রীঅরবিন্দের ভাষা বুঝিতে পারেন না তাহাদিগকে এই গ্রন্থের অমৃতময় এবং বহুল পবিমাণে অভিনব ভাবধারার কথঞ্চিৎ আস্বাদন দিবার জন্য আমি এ-গ্রন্থ অনুবাদ করিবার অনুমতি শ্রীমার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলাম। আর শেষোক্ত শ্রেণীর পাঠকগণ পরে যাহাতে ইহার সাহায্যে মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহা বুঝিতে পারেন প্রধানতঃ তজ্জন্য ইহার আক্ষরিক অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি ; তবে তাহা করিতে গিয়া ভাষার সাবলীলতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে আমি সাধ্যমত দৃষ্টি রাখিয়াছি। এই দুরূহ কার্য্যে কতটা সফলতা লাভ করিয়াছি তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

যোগের কথা বলিতে গেলে মানসাতীত অনেক তত্ত্বের আলোচনা করিতে হয় কিন্তু মনের ভাষায় সে সমস্ত ব্যক্ত করা অতি কঠিন ব্যাপার, এজন্য যোগতত্ত্ব সাধারণের পক্ষে দুরূহ। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ পূর্ব্বপ্রচলিত যোগগুলির সমন্বয় বলিয়া বিভিন্ন যোগপন্থার প্রায় সকল দুরূহতা এখানে একত্রিত হইয়াছে। তদুপরি সমন্বয় করিবার জন্য সে সমস্ত যোগপন্থাবলিতে যাহা নাই এমন অনেক অভিনব ভাবধারা, অভিনব তত্ত্ব তাঁহাকে যোগ করিতে হইয়াছে। তাহাতেও দুরূহতা বাড়িয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের রচনায় বাক্যের বক্তব্যবিষয় স্ফুটতর করিবার জন্য তৎসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের অবতারণা তিনি একই বাক্যের মধ্যে

বিশেষণরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন বলিয়া বহুস্থানে বাক্যগুলি বেশ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। এ ব্যবস্থায় তাঁহার বক্তব্যবিষয় খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু ইহাতে তাঁহার লেখা সাধারণ পাঠকের নিকট অধিকতর দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে যাহারা ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন এরূপ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁহার রচনা সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাই ধৈর্য্যসহকারে বিশেষ মনোযোগ দিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া, বলিতে গেলে এক প্রকার ধ্যানস্থ ও তদ্‌গত হইয়া শ্রদ্ধাব সহিত শ্রীঅরবিন্দের রচনা পড়িতে হয়, নৈলে অনেক সময় অর্থবোধ হয় না। আমি নিজে যথাসাধ্য এই ব্যবস্থানুসারে চলিযা তাঁহাব গ্রন্থগুলি বুঝিতে চেষ্টা কবিয়াছি। পাঠকগণেব নিকট আমাব অনুরোধ তাহারাও যেন এইভাবেই পড়িতে চেষ্টা করেন।

অনুবাদের ভাষা সহজবোধ্য করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি; বাংলা ভাষার প্রচলিত শব্দ ব্যবহারের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়াছি; যেখানে সেরূপ শব্দ খুঁজিয়া পাই নাই তথায় প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত বা গঠিত অপর মনীষীগণের ব্যবহৃত শব্দ গ্রহণ করিয়াছি। তবে বইএর মধ্যে যেখানে এরূপ শব্দ ব্যবহাব করিতে বাধ্য হইযাছি সেখানে—অন্ততঃপক্ষে যেখানে সে শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে—পাশে বন্ধনীব মধ্যে মূল ইংরাজি শব্দটি দিয়াছি।

সমগ্র গ্রন্থখানি একসঙ্গে প্রকাশ না কবিয়া সম্প্রতি ইহার অবতবণিকা ও দিব্য কর্ম্মযোগ নামক প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এ সম্বন্ধে আমি সানন্দ ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে জানাইতেছি যে এ-গ্রন্থ প্রণয়ন ও মুদ্রণ কার্য্যে আমার পরম সুহৃদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়েব নিকট নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি। পরমপণ্ডিত ও সাধক শ্রীমৎ স্বামী অনির্বাণ ইহার অবতরণিকা এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ঋষভচাঁদ সামসুখা এ খণ্ডের প্রায় সমস্ত দেখিয়া দিয়াছেন; সোদরপ্রতিম বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রভাকর মুখোপাধ্যায় ইহার সমগ্র পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন আর এ কার্য্য তিনি এত আন্তরিকতার সহিত এত প্রভূত পরিশ্রম সহকারে করিয়াছেন যে তিনি আমার শুধু সাহায্যকাবী নয় পরন্তু সহযোগী ও সহকর্মী হইয়া উঠিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু

অবতরণিকা

সমন্বয়ের সর্ত্ত

১

জীবন ও যোগ

মানুষের কর্ম্মের সকল বৃহত্তর রূপের মধ্যে, যাহা আমাদের সাধারণ গতি-বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত অথবা আমাদের নিকট উচচ ও দিব্য বলিয়া বোধ হয় এরূপ অসাধারণ ক্ষেত্রে ও পবিপূর্ণতার পথে যাহা আমাদিগকে অগ্রসর করিয়া দিতে চায় এই উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা অনুস্যূত প্রকৃতির ক্রিয়াধাবাতে দুইটি প্রয়োজন সাধিত হয বলিয়া মনে হয়। এরূপ প্রত্যেক ক্রিয়ার ধারা সুসমঞ্জস জটিলতা বা বহুভঙ্গিমা ও সমগ্রতার দিকে চলিতে চায, কিন্তু আবার তাহা ভাঙ্গিয়া পৃথক হইয়া পড়িয়া বিশেষ চেষ্টা ও প্রবণতার নানা প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হয়—শুধু একটা বৃহত্তর এবং অধিকতর শক্তিশালী সমন্বয়ের মধ্যে আসিয়া পুনরায় মিলিত হইবার জন্য। দ্বিতীযতঃ কোন কিছু কার্য্যকরীভাবে প্রকাশের জন্য তাহার রূপরাজির গঠন ও পরিণতিসাধন একটা অলঙ্ঘ্য বিধান, অথচ যদি কঠোরভাবে প্রণালীবদ্ধ করিয়া ফেলা হয়, তবে সকল সত্য ও সাধনা পুরাতন হইয়া পড়ে এবং তাহাদের গুণ বা শক্তির সমগ্র না হইলেও অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যায়; যদি তাহাকে নূতন জীবনলাভ করিতে হয় তবে বিশ্বপুরুষের নূতন প্রবাহের দ্বারা মৃত বা মরণোন্মুখ রূপ বা বাহনকে পুনরুজ্জীবিত এবং রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে সর্ব্বদা নবায়িত করিতে হইবে। নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে পুনঃপুনঃ জাত হওয়াই জড়ের ক্ষেত্রে অমরত্বের বিধান। আমরা যে যুগের মধ্যে রহিয়াছি তাহা যেন নিদারুণ প্রসব-বেদনাতে পূর্ণ, এযুগে চিন্তা ও ক্রিয়ার যে সকল রূপের মধ্যে নিজস্ব ভাবে উপযোগী হওয়ার কোন প্রবলশক্তি অথবা স্থায়ী হওয়ার মত কোন প্রচ্ছন্ন গুণ আছে তাহাদিগকে মহাপরীক্ষার অধীন করা এবং পুনর্জ্জন্মলাভের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান জগৎ মায়াবিনী মিডিয়ার (Media) এক প্রকাণ্ড কটাহের আকার ধারণ করিয়াছে, সর্ব্ববস্তু তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহাদিগকে ছিঁড়িয়া

খণ্ড খণ্ড করিয়াফেলা হইতেছে, তাহাদের পরীক্ষা চলিতেছে, একভাবে মিলিত করিয়া আবার ভাঙ্গিয়া অন্যভাবে পুনর্মিলিত করা হইতেছে, এ সমস্তের ফলে হয় সে বস্তুটি বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং তাহাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপাদান অন্যরূপ গঠনের কার্য্যে লাগিতেছে অথবা রূপান্তর এবং নবযৌবনলাভ করতঃ তাহা পুনরায় জীবনের নূতন এক অধ্যায় আরম্ভ করিতেছে। ভারতীয় যোগ মূলতঃ প্রকৃতির কতকগুলি মহাশক্তির বিশেষ ক্রিয়া বা রূপায়ণ, ইহা নিজস্ব বিশেষ ভাবে গঠিত, বহুধাবিভক্ত এবং নানারূপে প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে; নিজের প্রচ্ছন্নশক্তিতে ইহা মানবজাতির ভবিষ্য জীবনের এইসব বীর্য্যবন্ত ও সক্রিয় মূল উপাদানের অন্যতম। স্মরণাতীত কালে জাত এ সন্তান নিজের প্রাণশক্তি ও সত্যের বলে আজ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়াছে এবং যেখানে সে আশ্রয় লইয়াছিল সেই গোপন সম্প্রদায় ও তপস্বীগণের নির্জন আশ্রম হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে আর মানুষের জীবন্ত শক্তি ও উপযোগিতা সকলের ভবিষ্য সমষ্টির মধ্যে নিজের স্থান খুঁজিতেছে। কিন্তু প্রথমে তাহার নিজেকে পুনরাবিষ্কৃত করিতে হইবে এবং সে নিজে যাহার চিহ্ন বা নিদর্শন সেই সাধারণ সত্য ও প্রকৃতির বিরামবিহীন উদ্দেশ্য সাধন প্রচেষ্টার মধ্যে তাহার নিজসত্তাব গভীরতম হেতু বা কারণ পুরোভাগে আনিয়া স্থাপিত করিতে এবং নূতন আত্মজ্ঞান ও আত্মমূল্যাবধারণের দ্বারা নিজের বৃহত্তর সমন্বয়ের আবিষ্কার ও পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। নিজেকে সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া ইহা মানবজাতির পুনর্গঠিত জীবনের মধ্যে আরও সহজ ও শক্তিশালীভাবে প্রবেশ করিবে, ইহার প্রণালীসমূহের দাবী এই যে তাহারা সে জীবনকে ভিতরের দিকে তাহার সত্তা এবং ব্যক্তিত্বের গর্ভগৃহে বা অন্তরতম গোপনকক্ষে লইয়া যাইবে এবং উপরের দিকে তাহার উচ্চতম শিখরে পৌঁছাইয়া দিবে।

জীবন ও যোগ এ উভয়কে যথার্থ দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে যে সমগ্র জীবনই এক যোগ—সচেতন বা অবচেতনভাবে। কারণ যোগ শব্দ দ্বারা আমরা আমাদের সত্তার মধ্যে যাহা কিছু প্রচ্ছন্ন ও অব্যক্তভাবে রহিয়াছে তাহাদিগকে বিকশিত ও প্রকাশিত করিয়া আত্মসম্পূর্ণতা লাভের এবং মানুষ ও বিশ্বের মধ্যে যাহার আংশিক প্রকাশ দেখিতে পাই বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত সেই সত্তার সঙ্গে ব্যষ্টি মানবসত্তার মিলনসাধনের এক সুপ্রণালীবদ্ধ প্রচেষ্টা বুঝি। বাহ্যজীবনের পশ্চাতের দিকে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে সমগ্রজীবন প্রকৃতির এক বিশাল যোগ, যাহা তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন এবং অব্যক্ত আছে তাহা ক্রমশঃ অধিকতরভাবে প্রকাশ করিয়া প্রকৃতি তাহার নিজের

জীবনকে এরূপ অস্বীকার, তাহাদের পরিণতির কোন গোপন বিধানের জন্য কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে যথার্থ মনোভাব হইতে পারে, কিন্তু মানব-জাতির অভিপ্রেত উদ্দেশ্য কখনই হইতে পারে না। সুতরাং যাহা দেহকে উপেক্ষা করে অথবা তাহার লোপ বা বর্জন পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার পক্ষে অপরিহার্য্য মনে করে, তাহা কখনই পূর্ণযোগ হইতে পারে না। বরং দেহের পূর্ণতা সাধন করিয়া তোলাও চিৎসত্তার চরম বিজয় বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত, দৈহিক জীবনকে দিব্যভাবে বিভাবিত করা ভগবানের বিশ্বলীলার চরমোৎকর্ষ। আধ্যাত্মিকতার পথে জড় বাধা সৃষ্টি করে একথা তাহাকে বর্জন করিবার যুক্তি-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না; কেননা অদৃশ্য ভগবদ্ বিধানে আমাদের প্রবলতম বাধাই আমাদের সর্ব্বোত্তম সুযোগ। প্রবল বাধা আমাদের নিকট প্রকৃতির নির্দ্দেশ যে আমাদিগকে এক পরম বিজয় অর্জন এবং এক চরম সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, জড় ভাবকে অমোচনীয় পাশ বলিয়া তাহাকে পরিহার অথবা আমাদের পক্ষে অজেয় প্রবল শত্রু বলিয়া তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিতেই হইবে, প্রকৃতির ইহা নির্দ্দেশ নয়।

প্রাণ এবং স্নায়ুর শক্তিরাজিও আমাদের মধ্যে অনুরূপ বৃহৎ উপযোগিতা সাধনের জন্যই রহিয়াছে; আমাদের চরম পরিপূর্ণতার মধ্যে তাহারাও তাহাদের সম্ভাবনাসমূহের দিব্য উপলব্ধি দাবী করে। বিশ্ব পরিকল্পনার মধ্যে আমাদের এই অঙ্গের উপর যে মহৎ কার্য্যভার অর্পন করা হইয়াছে উপনিষদের উদার জ্ঞান তাহা বিশেষভাবে জোর দিয়া বলিয়াছে। "রথচক্রের নাভিতে শলাকাসমূহের ন্যায় এই প্রাণেই তিন বেদ বা ত্রিবিদ্যা, যজ্ঞ, সবলের শক্তি, জ্ঞানীর পবিত্রতা প্রভৃতি সবকিছু প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ত্রিদিবে যাহা কিছু অবস্থিত আছে তাহা সমস্তই প্রাণশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন।"* সুতরাং যাহা এই সমস্ত স্নায়ুর শক্তিকে ধ্বংস করে, তাহাদিগকে নিশ্চলতায় পরিণত হইতে বাধ্য করে, অথবা অনিষ্টকর ক্রিয়াবলীর উৎপত্তিস্থান মনে করিয়া তাহাদিগের মূলোৎপাটন করে তাহা পূর্ণযোগ নয়; তাহাদের ধ্বংস নয়—শুদ্ধি, তাহাদিগের নিয়ন্ত্রণ, রূপান্তর এবং ব্যবহারই উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যেই তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং আমাদের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

বিবর্ত্তনের ধারায় প্রকৃতি তাহার ভিত্তিভূমি এবং প্রথম সাধনযন্ত্ররূপে আমাদের জন্য শারীরিক জীবন যদি দৃঢ়ভাবে গঠিত করিয়া থাকে তবে তাহার পরবর্ত্তী সাক্ষাৎ লক্ষ্য এবং উচ্চতর যন্ত্ররূপে আমাদের মনোময় জীবনকে

* প্রশ্ন উপনিষদ (২/৬, ১৩)

বিকশিত করিয়া তুলিতেছে। তাহার সাধারণ সমুন্নতির সময় ইহাই তাহার উচচ অভিনিবেশকর ভাবনা ; যখন সে অবসন্ন হইয়া পড়ে, বিশ্রাম লাভ করিবার এবং পুনরায় সতেজ ও সবল হইবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিত হয় সেই সমস্ত সময় ছাড়া যখনই সে প্রাণ ও দেহের প্রাথমিক সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতা হইতে মুক্ত হয় তখন ইহাই তাহার সর্ব্বদা অনুসরণের বিষয় হইয়া উঠে। কেননা এখানে মানুষের মধ্যে এক বৈশিষ্ট্য আছে যাহা পরম প্রয়োজনীয় বস্তু। তাহার মধ্যে যে শুধু একপ্রকার মননশীলতা আছে তাহা নয়, তাহার দুইটি এমনকি তিনটি মন আছে, প্রথম আছে জড়ময় স্নায়বিক মন, দ্বিতীয়টি হইল শুদ্ধবুদ্ধিময় মন যাহা দেহের ও ইন্দ্রিয়ের বিভ্রান্তি সকল হইতে নিজেকে মুক্ত করে, তৃতীয় তাহার বুদ্ধির উপরে এক দিব্য মন আছে যাহা আবার বিশেষত্বজ্ঞাপক এক কল্পনাপ্রবণ বিচারবুদ্ধির সকল অপূর্ণ বিভাব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখে। মানুষের মন প্রথমত দৈহিক জীবনের জালে বিজড়িত থাকে, উদ্ভিদ-জীবনে মন পূর্ণ সংবৃত এবং পশুর মন সর্ব্বদা অবরুদ্ধ। মন এই প্রাণকে তাহার ক্রিয়াবলির প্রাথমিক দশা বলিয়া যে শুধু গ্রহণ করে তাহা নহে, তাহার সমগ্র অবস্থা বা গতির সহিত ইহা জড়ীভূত হইয়া থাকে এবং এমনভাবে নিজের প্রয়োজন সাধনের চেষ্টা করে যেন তাহাই তাহার সত্তার পরিপূর্ণ লক্ষ্য। কিন্তু মানুষের দৈহিক জীবন তাহার এক ভিত্তি, তাহার লক্ষ্যবস্তু নহে, ইহা তাহার প্রাথমিক অবস্থা, তাহার শেষ গতি-পথনির্দ্ধারক নহে। প্রাচীনগণের যথাযথ ধারণায় মানুষ মূলতঃ ভাবুক, মনু, মনোময় সত্তা, সে প্রাণ ও দেহের নেতা,* তাহাদের দ্বারা চালিত পশু নয়। সুতরাং প্রকৃত মানব জীবন কেবল তখনই আরম্ভ হয় যখন বুদ্ধিপ্রধান মননশীলতা জড়ভাব হইতে বাহির হইয়া আসে এবং আমরা স্নায়বিক ও দৈহিক আবেশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে মনে ক্রমশঃ অধিকতর রূপে বাস করিতে থাকি এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের পরিমাণ অনুসারে দৈহিক জীবন যথাযথভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিতে পারি। কেননা কর্ম্মকুশল অধীনতা স্বীকার নয়, স্বাধীনতাই প্রভুত্ব লাভের উপায়। বাধ্য হইয়া নয় বরং স্বাধীনভাবে দৈহিক সত্তার প্রসারিত এবং ঊর্দ্ধায়িত অবস্থাবলি গ্রহণ করাই মানুষের উচচ আদর্শ।

এইভাবে মানুষের মধ্যে যে মনোময় জীবন অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে বস্তুতঃ সকল মানুষ তাহার উপর সমান অধিকার পায় নাই। বাস্তবিক পরি-দৃশ্যমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে ইহা পূর্ণতমরূপে যেন কেবল কতিপয়

* "মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা"- -মুণ্ডকোপনিষদ (২।২।৭)

প্রায়ই বর্ণিত হয় বাস্তবিকপক্ষে তাহার পরিমাণ তত বেশী নহে। তাহাদের কতকগুলি নূতন প্রকাশের অপরিণত প্রারম্ভ; অপর কতকগুলি সহজ সংশোধনযোগ্য ভাঙ্গনের ক্রিয়া যাহার ফলে প্রায়ই নব নব ক্রিয়াধারা দেখা দেয় এবং প্রকৃতির দৃষ্টিপথে যে সুদূর লক্ষ্য রহিয়াছে তাহার জন্য যে স্বল্পমূল্য অবশ্য-দেয় ইহা তাহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা হয়ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিব যে মানুষের মধ্যে মনোময় জীবনের আবির্ভাব আধুনিক ঘটনা নহে, মানুষ পূর্ব্বেই তাহা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু মানবজাতির মধ্যস্থিত বিশ্বশক্তি শোচনীয়ভাবে যতবার স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে তাহার অন্যতম হইল মনোময় জীবনের অধঃপতন, বর্ত্তমানে মানুষের মধ্যে আবার সে-জীবনের দ্রুত পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। বর্ব্বর মানুষ হয়ত সভ্য মানুষের প্রথম পূর্ব্বপুরুষ ততটা নয় যতটা সে পূর্ব্ববর্ত্তী সভ্যতার অধঃপতিত বংশধর। কেননা মননের ক্ষেত্রে মানবজাতি বস্তুতঃ যাহা লাভ করিয়াছে তাহা মানুষের মধ্যে অসমানভাবে ছড়ানো রহিয়াছে বটে কিন্তু মনোময় জীবন লাভের সামর্থ্য সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে মানবের যে জাতি সভ্যতার নিম্নতম স্তরে অবস্থিত—যেমন মধ্য আফ্রিকার চিরন্তন বর্ব্বরতার মধ্যস্থ নিগ্রোজাতি—বলিয়া আমাদের দ্বারা বিবেচিত হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে নবাগত কোন ব্যক্তির মধ্যে সভ্য-জাতির সহিত রক্তের সংমিশ্রণ না ঘটা সত্ত্বেও বুদ্ধিগত সংস্কৃতি লাভ করিবার সামর্থ্য রহিয়াছে, এবং এজন্য তাহাকে তাহার ভবিষ্যৎ পুরুষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় নাই; যদিও সে-সংস্কৃতি প্রভাবশালী ইউরোপীয় বুদ্ধির উৎকর্ষের সমতুল্য হয় নাই। এমন কি এই জাতীয় সাধারণ লোকও অনুকূল পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত হইলে কয়েক পুরুষের মধ্যেই এতটা অগ্রসর হইতে পারে বলিয়া মনে হয়, যাহার জন্য সহস্র সহস্র বৎসর লাগিতে পারিত। তাহা হইলে হয় মনোময় সত্তা হওয়ার বিশেষ অধিকারের জন্য পরিণাম ধারার বিলম্বকর বিধানসকলের পূর্ণ ভার হইতে মানুষকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে, নতুবা বলিতে হইবে যে বাস্তব জীবনের ক্রিয়াসকলের জন্য অত্যাবশ্যক সামর্থ্যের এক উচ্চ ভূমিতে মানুষ পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত আছে এবং অনুকূল অবস্থা ও যথাযথ উত্তেজক পরিবেশের মধ্যে পড়িলে তাহা সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইতে পারে। মানসিক অসামর্থ্য নয়, দীর্ঘকাল ব্যাপী সুযোগের বর্জন বা তাহা হইতে দূরে অবস্থান এবং উদ্বোধক অভিঘাত বা আবেগের অপসরণই বর্ব্বরতা সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ব্বরতা মধ্যবর্ত্তী কালের নিদ্রা, আদিম অন্ধকার নহে।

তাহা ছাড়া পর্য্যবেক্ষকের চক্ষুতে ধরা পড়ে যে মানুষের মধ্যে প্রকৃতিরই

ইহাই যদি বিশ্বের সত্য হয় তাহা হইলে বিশ্বের যাহা কারণ বা উৎপত্তিস্থান তাহাই পরিণামধারার চরম লক্ষ্য, ইহা সেই সদ্‌বস্তু যাহা বিশ্বের সকল উপাদানের মধ্যে অন্তর্নিহিত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্য হইতেই মুক্ত হইতেছে। কিন্তু মুক্তি নিশ্চয়ই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে যদি মুক্তির অর্থ শুধু পলায়ন হয় এবং যে সকল বস্তু ও ক্রিয়াধারার মধ্যে তাহা অন্তর্নিহিত ছিল তাহাদের উপর ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে যদি উন্নীত ও রূপান্তরিত না করে। যদি পরিণামে এই রূপান্তরসাধন না হয় তাহা হইলে তাহার অন্তর্নিহিত থাকিবার কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু মানুষের মন যদি দিব্য আলোকের জয়শ্রীধারণে সমর্থ হয়, তাহার ভাবা-বেগ এবং রস-চেতনা যদি পরমানন্দের ছাঁচে রূপান্তরিত হয় এবং তাহার পরি-মাণ ও গতি পরিগ্রহ করে, মানুষের ক্রিয়া যদি এক নিরহঙ্কার দিব্য শক্তিকে ব্যক্ত করে এবং নিজেকে তাহারই এক গতি বলিয়া অনুভব করে, যদি আমাদের সত্তার জড় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে উর্দ্ধস্থ সদ্বস্তুর বিশুদ্ধির অংশ গ্রহণ করে এবং তাহা এই সমস্ত উচ্চতম অনুভূতি এবং কার্য্যসাধিকা শক্তিকে ধারণ ও প্রবর্দ্ধন করিবার জন্য যদি নমনীয়তার সহিত স্থায়ী অপরিবর্ত্তনীয়তার যথাযথ-ভাবে মিলনসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে প্রকৃতির সুদীর্ঘ সাধনা বিজয়ী এক সার্থকতার মধ্যে শেষ হইবে এবং তাহার পরিণামধারা তাহাদের গভীর তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিবে।

এই পরম জীবনের একটা আভাস বা ঈষৎ স্ফুরণও এরূপ অপরূপ অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ সম্পদে বিভূষিত, তাহার আকর্ষণ এমন দুর্বার ও মনপ্রাণ-বিমোহন যে একবার এ অনুভূতি লাভ করিলে আমরা বোধ করি ইহাকে অনুসরণ করিতে গিয়া অন্য সব কিছুকে সহজেই উপেক্ষা করিতে পারি। এমন কি যাহা সব কিছু মনের মধ্যে দেখিতে অভ্যস্ত এবং মনোময় জীবনে একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট থাকাই যাহার আদর্শ তাহার বিপরীত এক অবস্থায় অতিমাত্রায় অভিভূত হইয়া মানুষ মনকে এক অযোগ্য বিকৃতি এবং পরম বাধা বলিয়া দেখিতে আরম্ভ করে, মনে করে মনই মায়াময় বিশ্বের উৎপত্তিস্থান, মনই সত্যের নিষেধ বা অস্বীকৃতি এবং আমরা যদি চরম মুক্তি চাই তবে মনকে অস্বীকার করিতে, তাহার সকল কর্ম্ম ও ফলকে লয় করিতে হইবে। কিন্তু ইহা একটি অর্দ্ধসত্য, মনের বর্ত্তমান সীমাসমূহে অভিনিবিষ্ট হইবার এবং তাহার দিব্য উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করিবার ফলেই ইহার মধ্যে ভ্রম দেখা দেয়। তাহাই চরম জ্ঞান যাহা ঈশ্বরকে যেমন জগতের মধ্যে তেমনি জগদতীত অবস্থায় অনুভব ও স্বীকার করে, তদ্রূপ তাহাই পূর্ণযোগ যাহা জগদতীত সত্তাকে

বস্তুতঃ কিন্তু জড় প্রকৃতির মধ্যে এক জাতীয় প্রাণী হইতে অন্য জাতীয় প্রাণীতে, উদ্ভিদ হইতে পশুতে, পশু হইতে মানুষে একটা অগ্রগতি আছে ; কেননা অচেতন জড়ের মধ্যেও মনের ক্রিয়া আছে। কিন্তু বাস্তবে একবার এক ধরণের প্রকৃতিবিশিষ্ট জাতি অন্য সকল হইতে পৃথক হইয়া নির্দ্ধারিত রূপে দেখা দিলে পৃথ্বী জননী যেন সাক্ষাৎভাবে প্রধানতঃ অভিনিবিষ্ট হইয়া অবিরত পুনঃপুনঃ উৎপাদন দ্বারা সেই জাতিকে বজায় রাখিতে চাহেন। কারণ প্রাণ সর্ব্বদা অমরত্ব খোঁজে ; কিন্তু যে চেতনা বিশ্বসৃষ্টি করে তাহার মধ্যে, যেহেতু ব্যষ্টিরূপ অস্থায়ী এবং রূপের ধারণা বা প্রত্যয় স্থায়ী—কেননা সেখানে ইহার লোপ ঘটে না—অবিরামভাবে এইরূপ পুনঃপুনঃ উৎপাদনই কেবল একমাত্র সম্ভবপর জড়াত্মক অমরত্ব। তাই আত্মরক্ষা, আত্মপুনরাবৃত্তি, আত্মবহুলীকরণ অবশ্যম্ভাবীরূপে সকল জড়ময় সত্তার প্রধান সহজাত প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

পরিবর্ত্তন শুদ্ধ মনঃশক্তির বৈশিষ্ট্যসূচক ক্রিয়া, এবং যতই ইহা সুগঠিত এবং সমুন্নত হইতে থাকে ততই মনের এই বিধান, যাহা সে লাভ করে তাহাকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত বিস্তৃত সমুন্নত ও অধিকতরভাবে সুবিন্যস্ত করিবার দিকে লইয়া যায়, এবং এইভাবে সে ক্ষুদ্র ও সরল হইতে বৃহত্তর এবং জটিলতর পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়। কেননা মন তাহার ক্ষেত্রে অনন্ত, প্রসারতায় সাবলীল বা নমনীয়, রূপায়ণে সহজেই বৈচিত্র্যপরায়ণ, এ বিষয়ে তাহার প্রকৃতি দৈহিক জীবন হইতে অন্যবিধ। তাই পরিবর্ত্তন আত্মপ্রসারণ এবং আত্মোন্নতির দিকে তাহার যথার্থ সহজ প্রবৃত্তি আছে। সে সীমাহীন আত্মোৎকর্ষে শ্রদ্ধাবান, প্রগতিই তাহার মূলমন্ত্র।

স্বয়ম্ভূ পূর্ণতা ও অপরিবর্ত্তনীয় আনন্ত্য চিদাত্মার স্বাভাবিক বিধান। নিজ স্বত্ব বা অধিকার বলেই তাহা সর্ব্বদা প্রাণের যাহা লক্ষ্য সেই অমরত্বের এবং মনের যাহা চরম উদ্দেশ্য সেই পূর্ণতার অধিকারী। আধ্যাত্মিক জীবনের পরমৈশ্বর্য্য হইল শাশ্বত বস্তুকে লাভ, এবং যাহা সর্ব্ববস্তুতে এবং সর্ব্ববস্তুর অতীত অবস্থায় একই থাকে, জগতে বা তাহার বাহিরে সর্ব্বত্র যাহা পরমানন্দময়, যাহার মধ্যে তাহা বাস করে তাহার রূপ ও ক্রিয়াধারা সকলের অপূর্ণতা ও সীমাবন্ধনের দ্বারা যাহা অপরামৃষ্ট, তাহার উপলব্ধি।

জীবনের এই তিনরূপের প্রত্যেকের মধ্যে প্রকৃতি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত এই উভয়ভাবে ক্রিয়া করে ; কেননা শাশ্বত বস্তু ব্যষ্টি রূপায়ণে এবং সমষ্টি সত্তার মধ্যে তুল্যভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন—যে সমষ্টিসত্তা পরিবার সম্প্রদায় বা জাতি অথবা যাহা ততটা ভৌতিকবস্তু নহে এমন কোন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সংঘ অথবা সকল সমষ্টির যাহা চরম বস্তু সেই সমগ্র মানবজাতি হইতে পারে।

কিন্তু সেই উপযোগিতার জন্যই এরূপ ব্যক্তিবর্গ এবং তাহারা যে জীবন যাপন করে তাহা অপরিহার্য্যভাবে সীমিত, অযৌক্তিকভাবে রক্ষণশীল এবং পার্থিব পরিবেশে বদ্ধ হইয়া পড়ে। চিরাচরিত বাঁধাধরা নিয়মাবলি, চির-প্রচলিত প্রতিষ্ঠানসকল, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বা চিরাভ্যস্ত চিন্তাধারা সকল—এই সমস্ত তাহাদের মজ্জাগত। অতীতে প্রগতিশীল মন যে সমস্ত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে বাধ্য করিয়াছে তাহা তাহারা স্বীকার করে এবং আগ্রহভরে তাহাদিগকে সমর্থন ও রক্ষা করে. কিন্তু সেই প্রগতিশীল মন বর্ত্তমানকালে যে সকল পরিবর্ত্তন আনিতে চায় তাহারা ঠিক তেমনি উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কেননা জড়াসক্ত মানুষ প্রগতিশীল জীবন্ত ভাবুককে কেবল একজন কল্পনাপ্রিয় স্বপ্নবিলাসী বা উন্মাদ বলিয়াই মনে করে। প্রাচীন সেমেটিক জাতীয় যে সমস্ত ব্যক্তি জীবন্ত ভগবদ্বাণী প্রচারক গণকে শিলাঘর্ষণে নিহত করিত এবং মৃত্যুর পর তাহাদের স্মৃতি পূজা করিত তাহারা প্রকৃতির মধ্যস্থিত সহজাত বৃত্তিযুক্ত বুদ্ধিহীন এই তত্ত্বেরই মূর্ত্তিমান অবতার। প্রাচীন ভারতে একবার জাত এবং দুইবার জাত ব্যক্তির (দ্বিজ) মধ্যে বিভেদ করা হইত, এই সমস্ত জড়ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে একবার জাত বলা যাইতে পারে। এরূপ ব্যক্তি প্রকৃতির নিম্নতর ক্রিয়াসাধন এবং উচ্চতর ক্রিয়ার ভিত্তি রক্ষা করে কিন্তু তাহার নিকট দ্বিজত্বের গৌরব সহজে উন্মুক্ত হয় না।

তথাপি অতীতে ধর্ম্মের মহৎ উচ্ছ্বাস তাহার চিরপ্রচলিত ধারাসকলের উপর যতটা আধ্যাত্মিকতা বাধ্য করিয়া আরোপ করিয়াছে এরূপ ব্যক্তি ততটা স্বীকার করে এবং যাহাদিগকে নিরাপদ এবং সাধারণ আধ্যাত্মিক খাদ্য সরবরাহ করিতে সমর্থ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় এমন পুরোহিত ও শিক্ষিত ধর্ম্মতত্ত্ববিদের একটা পূজ্য অথচ অধিকাংশক্ষেত্রে নির্বীর্য্য স্থান তাহার সমাজ-জীবনের মধ্যে রাখিয়া দেয়। কিন্তু যিনি নিজের জন্য আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন তাহাকে যদিই বা সে স্বীকার করে, তখন তাহাকে পুরোহিতের নামাবলিতে সজ্জিত করে না, সন্ন্যাসীর গৈরিক বস্ত্র পরাইয়া দেয়; তাহার বিপজ্জনক স্বাধীনতা অনুসারে সে যদি কাজ করিতে চায় তবে তাহার স্থান সমাজের বাহিরে। এমন কি সে ব্যক্তি এই ভাবে মানবরূপী বিদ্যুৎ-পরিচালক-দণ্ড * হইয়া চিৎসত্তার বিদ্যুৎগ্রহণকরতঃ

* গৃহকে বজ্রপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যবহৃত লৌহ বা তাম্র শলাকা।
—অনুবাদক

সে প্রতীকরূপে ব্যবহার করে সমষ্টিগতভাবে তাহার উন্নতির দিকে পরিপূর্ণ উদাসীন থাকিয়া ব্যষ্টির হিতের জন্য বাহ্য জীবনকে এই ভাবে ব্যবহার করিতে পারে। যেহেতু শাশ্বত সত্যবস্তু সর্ব্ববস্তুতে সর্ব্বদা একইরূপে বর্ত্তমান, আবার শাশ্বতের মধ্যেও সর্ব্ববস্তু একই রূপে অবস্থিত এবং যেহেতু নিজের মধ্যে একমাত্র কাম্য মহাসিদ্ধিকে লাভ করিবার তুলনায় কর্ম্মের যথার্থ রীতি এবং ফলের কোন মূল্য নাই, তাহার নিজের চরম সিদ্ধি লাভ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাহার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে সদা প্রস্তুত এই আধ্যাত্মিক উদাসীনতা যে কোন পরিবেশ আসুক না কেন, যে কোন কর্ম্ম উপস্থিত হউক না কেন তাহাকে অনাসক্তভাবে স্বীকার করে। গীতার আদর্শ অনেকে এই ভাবেই বুঝিয়াছে। অথবা সৎকার্য্য সেবা ও করুণার মধ্য দিয়া অন্তরস্থ প্রেম ও আনন্দ, এবং জ্ঞান দানের মধ্য দিয়া অন্তরের সত্য নিজেদিগকে জগতের উপর ঢালিয়া দিতে পারে; কিন্তু তাহার ফলে জগৎকে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে পারে, সুতরাং জগৎ তাহার অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতি অনুসারে পাপ ও পুণ্য, সত্য ও মিথ্যা, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বের চির যুদ্ধক্ষেত্র থাকিয়াই যায়।

কিন্তু প্রগতিও যদি জগৎজীবনের এক প্রধান বস্তু হয়, ঈশ্বরের ক্রম-বর্দ্ধমান অভিব্যক্তিই যদি প্রকৃতির যথার্থ্য তাৎপর্য হয় তাহা হইলে এই সীমা-নির্দ্দেশও ঠিক নহে। জগতে আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে জড়জীবনকে তাহার নিজের প্রতিচ্ছবি অথবা ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি রূপে রূপান্তরিত করা সম্ভব, শুধু সম্ভব নয় তাহাই প্রকৃতির প্রকৃত জীবন-ব্রত। তাই দেখিতে পাই, যাঁহারা নির্জনে নিজের একক মুক্তির জন্য সাধনা করিয়াছেন এবং তাহা লাভ করিয়াছেন সেই সমস্ত মহাসাধক ছাড়া আরও অনেক আধ্যাত্মিক পথের মহা-গুরু আসিয়াছেন যাঁহারা অপরকেও মুক্ত করিয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি দেখিতে পাই সেই সমস্ত মহাবলশালী আত্মাকে যাঁহারা চিৎপুরুষের পরম শক্তিতে নিজদিগকে জড়জীবনের একত্র সংঘবদ্ধ সকল শক্তি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী বোধ করিয়া জগতের উপর আত্মবিস্তার করিয়াছেন, পরম প্রেমভরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাহার রূপান্তরে তাহার নিজ সম্মতি জোর করিয়া আদায় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণতঃ মানবজাতির মানসিক এবং নৈতিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে সে চেষ্টা কেন্দ্রীভূত থাকে, কিন্তু এ চেষ্টাকে প্রসারিত করিয়া আমাদের জীবনের রূপ ও প্রতিষ্ঠান সকলেরও এরূপ পরিবর্ত্তন সাধনে প্রযোগ করা যাইতে পারে যে তাহারাও যাহার মধ্যে চিৎপুরুষ নিজেকে ঢালিয়া দিতে পারেন তদ্রূপ উৎ-

প্রতীকের মধ্যে 'সত্যের' প্রকাশের যুগ, যে সমস্ত যুগে প্রদীপ্ত পরিতৃপ্ত এবং আনন্দোদ্ভাসিত মানবজাতির মধ্যে প্রকৃতির বৃহৎ কর্ম্ম 'কৃত', সম্পাদিত ও পূর্ণ হয় এবং প্রকৃতি তাহার সাধনার চরমোৎকর্ষে পৌঁছে।

বিশ্বজননীকে আর ভুল না বুঝিয়া তাহাকে অপবাদ না দিয়া অথবা তাহার প্রতি অযথা ব্যবহার না করিয়া তাহার ক্রিয়ার প্রকৃত অর্থ ও অভিপ্রায় মানুষকে জানিতে ও বুঝিতে হইবে, এবং বীর্য্যবত্তম উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার উচ্চতম আদর্শে পৌঁছিবার জন্য সর্ব্বদা আস্পৃহা জাগরূক রাখিতে হইবে।

যোগপন্থাবলী

মানুষের মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগ এবং তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সাধনার এ সমস্ত বিভিন্ন উদ্দেশ্য এবং উপযোগিতার মধ্যে এই যে সকল সম্বন্ধ আমাদের প্রাকৃতিক পরিণামধারার সংক্ষিপ্ত পরিবীক্ষণের মধ্যে দেখা গিয়াছে, আমরা দেখিতে পাইব যে বিভিন্ন যোগপন্থার মূল তত্ত্ব এবং পদ্ধতির মধ্যে সেই সমস্তই রহিয়াছে। আমরা যদি তাহাদের সাধনার কেন্দ্রগত অঙ্গগুলির এবং প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসকলের একত্র মিলন ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে চাই তবে দেখা যাইবে যে এ-কার্য্যে প্রকৃতিদত্ত ভিত্তির মধ্যেই আমাদের সমন্বয়ের স্বাভাবিক ভিত্তি এবং তাহার বিধান রহিয়াছে।

অবশ্য এক হিসাবে যোগ বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রিয়াধারা অতিক্রম করিয়া তাহার উপরে উঠিয়া যায়। কেননা বিশ্বজননীর উদ্দেশ্য তাহার নিজের খেলার এবং সৃষ্টির মধ্যে ভগবানকে আলিঙ্গন করা এবং তথায় তাহাকে সত্য করিয়া তোলা। কিন্তু যোগের ঊর্দ্ধতম উন্নয়নে প্রকৃতি নিজেকে ও জগৎকে অতিক্রম করিয়া, এমন কি বিশ্বপ্রপঞ্চ হইতে অপসৃত হইয়া দিব্য-পুরুষকে তাহার স্বরূপে উপলব্ধি করে। এইজন্য কেহ কেহ মনে করেন যে ইহাই যোগের উচ্চতম লক্ষ্য শুধু নহে, ইহাই একমাত্র সত্য এবং একান্তভাবে বরণীয় লক্ষ্য।

তথাপি তাহার বিবর্ত্তনের ধারার মধ্যে যাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে এমন

কিছুর মধ্য দিয়াই প্রকৃতি সর্ব্বদা নিজের বিকাশধারাকে অতিক্রম করিয়া যায়। ব্যষ্টিব্যক্তির হৃদয় তাহার উচ্চতম এবং বিশুদ্ধতম আবেগ উন্নীত ও বিশোধিত করিয়া বিশ্বাতীত আনন্দে অথবা অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বাণে পৌঁছিতে পারে; ব্যষ্টি মন তাহার সাধারণ ক্রিয়াধারা সকলকে মননের অতীত প্রজ্ঞায় রূপান্তরিত করিয়া অনির্ব্বচনীয়ের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করে এবং বিশ্বাতীত অখণ্ড একত্বের মধ্যে নিজের পৃথক সত্তা মিলাইয়া দিতে পারে। আর কেবল ব্যষ্টি ব্যক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি দ্বারা নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমিত আত্মাই প্রকৃতিব রূপায়ণসকলের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিয়া যে আত্মা নির্ব্বিশেষ, নিত্যমুক্ত এবং বিশ্বাতীত তাহাতে পৌঁছে।

কার্য্যক্ষেত্রে যোগসাধনাব কোন সম্ভাবনাব পূর্ব্বে তিনটি বস্তুর ধারণা একান্ত প্রয়োজন: এ তিনটি যেন তিনটি পক্ষ, কোনপ্রকার চেষ্টার পূর্ব্বে এ তিনেব একত্রে সম্মতি চাই—এ তিনটি ঈশ্বব প্রকৃতি এবং মানবাত্মা অথবা আরও দার্শনিক ভাষায বলিতে গেলে, বিশ্বাতীত বিশ্বগত এবং ব্যষ্টিগত সত্তা। ব্যষ্টিসত্তা এবং প্রকৃতি যদি নিজেদেব লইয়া শুধু থাকে তবে এক অপরের নিকট বদ্ধ হইবে এবং প্রকৃতিব অতি মন্থব গতিকে কিছুতেই অনুভবযোগ্যভাবে অতিক্রম করিতে পারিবে না। এ দুইয়ের অতীত কোনও তত্ত্বেব প্রয়োজন, যাহাকে প্রকৃতি হইতে মুক্ত এবং তদপেক্ষা বৃহত্তর হইতে হইবে, আমাদের এবং প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করিবে, আমাদিগকে উপরে নিজের কাছে টানিয়া লইবে এবং ব্যষ্টির ঊর্দ্ধ্বারোহণে প্রকৃতির সম্মতি তাহার স্বেচ্ছায় অথবা তাহার উপর জোর করিয়া আদায় কবিবে।

যোগের প্রত্যেক দর্শনে এই সত্যইএ-ধারণা স্বীকার করিবার প্রয়োজনীয়তা আনিয়া দিয়াছে যে, একজন ঈশ্বর, প্রভু, পরমপুরুষ বা পরাৎপর আত্মা আছেন, তাঁহাব দিকে অগ্রসর হইবার জন্যই সাধনা এবং তিনিই সিদ্ধির জন্য আলোক-স্রাবী স্পর্শ ও শক্তিদান করেন। ইহার অনুপূরক এ ধারণাও সমভাবেই সত্য যে যেমন ব্যষ্টির পক্ষে বিশ্বাতীত বস্তুর প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং সে তাঁহাকে চায় তদ্রূপ এক অর্থে বিশ্বাতীত পুরুষের পক্ষেও ব্যষ্টি প্রয়োজনীয় এবং তিনিও তাহাকে চাহেন; ভক্তিযোগে একথা দৃঢ়তার সহিত বহুবার বলা হইয়াছে। ভক্তের যেমন ভগবানের দিকে আকর্ষণ, তাঁহাকে পাইবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা আছে ঠিক তেমনিভাবে ভগবানও ভক্তকে চান এবং তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন।* জ্ঞানযোগের অস্তিত্ব থাকেনা যদি মানবরূপে জ্ঞানের অন্বেষু ও

---

* ভক্ত বা ভগবৎ প্রেমিক ভগবান বা ঈশ্বর—প্রেম ও আনন্দের প্রভু; ত্রয়ীর তৃতীয় তত্ত্ব ভাগবত প্রেমের দিব্য অনুভূতি।

এবং দেহে অসাধারণ স্বাস্থ্য, শক্তি ও নমনীয়তা আনয়ন করে ; এবং যে সমস্ত অভ্যাস দেহকে সাধারণ জড় প্রকৃতির অধীন ও সাধারণ ক্রিয়াধারার সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে তাহাদের কবল হইতে দেহকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করে। হঠযোগের প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে এই ধারণা রহিয়াছে যে এই বিজয়কে এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দেওয়া যায় যে মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে পর্য্যন্ত বহুল পরিমাণে জয় করা সম্ভব হয়। তাহার পর বহু সহায়ক ও আনুষঙ্গিক কিন্তু বিপুল আয়াসসাধ্য ও বিস্তারিত প্রণালীসকলের দ্বারা যাহা তাহার সর্ব্বপ্রধান সাধনযন্ত্র, শ্বাস প্রশ্বাসের সেই সমস্ত প্রক্রিয়া সাধনের জন্য হঠযোগী তাহার দেহকে সকলপ্রকার মলিনতা হইতে এবং স্নায়ুমণ্ডলীকে সর্ব্বপ্রকার প্রতিরোধ বা প্রতিবন্ধকতা হইতে মুক্ত করে। এ সমস্ত প্রক্রিয়াকে প্রাণায়াম, শ্বাস বা প্রাণশক্তির নিয়ন্ত্রণ বলা হয় ; কেননা শ্বাসপ্রশ্বাসই প্রাণশক্তি সকলের প্রধান দৈহিক ক্রিয়াধারা। প্রাণায়াম দ্বারা হঠযোগীর দুই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমতঃ ইহা দৈহিক উৎকর্ষকে পূর্ণ করিয়া তোলে ; জড়প্রকৃতির সাধারণ বহু প্রয়োজনীয়তা হইতে প্রাণশক্তি মুক্তি পায ; সতেজ স্বাস্থ্য, দীর্ঘকালস্থায়ী যৌবন এবং অনেকসময় অসাধারণ আয়ুলাভ হয। অন্যপক্ষে প্রাণায়াম প্রাণকোষে অবস্থিত বীর্য্যবতী কুণ্ডলিতা সর্পশক্তিকে জাগ্রত এবং যাহা সাধারণ মানবজীবনে লাভ হয় না চেতনার সেরূপ বহুভূমি, অনুভূতির বহুক্ষেত্র এবং অসাধারণ চিত্তবৃত্তিসমূহ যোগীর নিকট উন্মুক্ত করে, সেই সঙ্গে যে সমস্ত সাধারণ শক্তি ও চিত্তবৃত্তি তাহাতে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল তাহারাও বীর্য্যবত্তভাবে প্রগাঢ়তা লাভ করে। আরও অনেক আনুষঙ্গিক প্রণালীর দ্বারা হঠযোগীর কাছে এই সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা আরও সুস্পষ্ট ও অধিকতরভাবে অধিগত হয়।

তাই হঠযোগের ফল লোকচক্ষুতে বিস্ময়কর এবং সাধারণ বা জড়ভাবাপন্ন মনকে সহজেই অভিভূত করে। তবু পরিশেষে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি এই অতিবিশাল পরিশ্রমদ্বারা আমরা কি লাভ করিলাম ? ইহার ফলে জড় প্রকৃতির যে উদ্দেশ্য, অর্থাৎ জড়জীবনের রক্ষণ ও উচ্চতম পূর্ণতাবিধানের শক্তি, এমন কি এক অর্থে জড়জীবনের বৃহত্তরভাবে ভোগ করিবার সামর্থ্য অসাধারণ পরিমাণে লাভ হয়। কিন্তু হঠযোগের ত্রুটি এই যে বহুশ্রমসাধ্য এবং দুরূহ প্রক্রিয়াগুলি আমাদের সময় ও শক্তি এত অধিক পরিমাণে দাবী ও গ্রহণ করে, মানুষের সাধারণ জীবন হইতে যোগীকে এরূপ পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে যে, যে-সমস্ত ফল এ সাধনায় পাওয়া যায় তাহা জাগতিক জীবনের পক্ষে কাজে লাগানো, হয় অসম্ভব অথবা অতিপ্রবলভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

কেননা প্রাচীন রাজযোগের উদ্দেশ্য শুধু স্বরাজ্য, আত্মশাসন বা অন্তররাজ্য প্রতিষ্ঠা অথবা প্রত্যক্ বা অন্তর্ম্মুখীন চেতনার (Subjective Consciousness) দ্বারা তাহার নিজরাজ্যের সকল অবস্থা এবং ক্রিয়াধারার উপর পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন মাত্র ছিলনা ; বাহ্য সাম্রাজ্যলাভ, অন্তর্ম্মুখীন চেতনার দ্বারা বাহ্য কর্ম্মাবলী এবং পরিবেশের উপর প্রভুত্ব স্থাপনও তাহার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যেমন হঠযোগ দৈহিক জীবন এবং তাহার সামর্থ্যসকলকে অতিপ্রাকৃত পূর্ণতা দিবাব লক্ষ্য লইয়া দেহ ও প্রাণকে ব্যবহার করে আবার তাহাকে অতিক্রম করিয়া মনোময় রাজ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ রাজযোগ মনোময় জীবনের সামর্থ্যসকলকে অতিপ্রাকৃতভাবে পূর্ণ ও প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে মনকে লইয়া কার্য্য করে আবার তাহাকে অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু এই পদ্ধতির ত্রুটি এই যে ইহা সমাধিব বিভিন্ন অস্বাভাবিক অবস্থার উপর অতিরিক্ত পবিমাণে নির্ভর করে। এই সীমাবন্ধন প্রথমতঃ আমাদিগকে জড়জীবন হইতে কতকটা দূরে লইয়া যায় অথচ এই জড়জীবন আমাদের ভিত্তি এবং কার্য্যক্ষেত্র, যাহার মধ্যে মনোময় এবং অধ্যাত্মজগতের অজন সকল লইয়া আসিতে হইবে। বিশেষতঃ এই পদ্ধতিতে আধ্যাত্মিক জীবন সমাধির অবস্থার সহিত বড় বেশী বিজড়িত। জাগ্রত অবস্থায় এমনকি ক্রিয়াসকলের স্বাভাবিক ব্যবহার ও পরিচালনার মধ্যেও আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন ও তাহার অনুভূতিসকলকে পূর্ণরূপে সক্রিয় ও পরিপূর্ণভাবে ব্যবহারযোগ্য করিয়া তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু রাজযোগ জড়জীবনে অবতরণ এবং আমাদের সমগ্রসত্তাকে অধিকার করিবার পরিবর্ত্তে আমাদের স্বাভাবিক অনুভূতিসকলের পশ্চাতে অবস্থিত দ্বিতীয় স্থানীয় এক ভূমিতে প্রত্যাহৃত হইয়া যাইতে চায়।

রাজযোগ যাহা অধিকার না করিয়া পরিত্যাগ করিয়া যায়, ভক্তি জ্ঞান এবং কর্ম্মের ত্রিমার্গ সেই প্রদেশ জয় করিতে সচেষ্ট হয়। রাজযোগ হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, পূর্ণতালাভের সর্ত্ত ও বিধানরূপে সমগ্র মনোময় প্রকৃতিকে বহুশ্রমসাধ্য বিস্তৃত শিক্ষা দিবার জন্য, ইহা নিজেকে পূর্ণরূপে ব্যাপৃত রাখে না, কিন্তু কেন্দ্রস্থানীয় কোনও প্রধান তত্ত্বকে অর্থাৎ বুদ্ধি হৃদয় বা ইচ্ছা শক্তিকে জোর করিয়া ধরে এবং তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়াধারা যে সমস্ত সাধারণ এবং বাহ্য বিষয়ে ও ক্রিয়ায় অভিনিবিষ্ট থাকে তথা হইতে তাহাদের গতিমুখ-অন্যদিকে ফিরাইয়া আনে এবং ভগবানের উপর কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মান্তর বা রূপান্তর সাধন করে। আরও এক পার্থক্য এই যে—এবং এখানে

ধারণা বা প্রত্যয় জাগাইতে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এরূপ এক পন্থা মানুষের বুদ্ধি ও অনুভবের সমগ্র বিস্তারকে দিব্যস্তরে লইয়া যাইতে, চিন্ময় করিয়া তুলিতে পারে এবং মানবজাতির মধ্যে দিব্যজ্ঞানকে জন্ম দিবার জন্য বিশ্বপ্রকৃতির যে প্রসবযন্ত্রণা রহিয়াছে তাহার সমর্থন ও সার্থকতা সাধন করে।

ভক্তিমার্গের লক্ষ্য পরম প্রেম এবং আনন্দের উপভোগ : পরমপ্রভু ব্যক্ত পুরুষরূপে দিব্য প্রেমিক এবং জগতেব ভোক্তা এই ধারণাই সাধনার পথে স্বাভাবিকভাবে ইহা কাজে লাগায। জগৎ তখন প্রভুর এমন এক লীলাখেলা এবং মানুষের জীবন সে খেলার শেষ স্তর বলিয়া উপলব্ধি হয, যে খেলা আত্মগোপন এবং আত্মপ্রকাশের নানা অবস্থা বা ক্রম অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হয়। যাহার মধ্যে ভাবাবেগ অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে মানব-জীবনের তেমন সকল স্বাভাবিক সম্বন্ধকে কাজে লাগানো, তাহাদিগকে ক্ষণস্থায়ী জাগতিক সম্বন্ধে আর প্রযোগ না করিয়া যিনি পরমপ্রেমিক, পরম সুন্দর এবং পরম আনন্দময় তাহার আনন্দের জন্য প্রয়োগ করা—ইহাই ভক্তিযোগের তত্ত্ব। পূজা ও ধ্যানের একমাত্র উদ্দেশ্য দিব্য সম্বন্ধের জন্য সাধককে প্রস্তুত করা এবং সে সম্বন্ধের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি করা। এই যোগ ভাবাবেগময় সকলপ্রকার সম্বন্ধকে উদারভাবে ব্যবহার করে, তাই দেখা যায় ভগবানের প্রতি শত্রুতা এবং বিরোধিতা প্রেমেরই এক তীব্র অধীর এবং প্রতীপ বা বিপবীতমুখী রূপ এবং তাহাও মুক্তি ও সিদ্ধির এক সম্ভবপর উপায় বলিযা বিবেচিত হইযাছে। এই মার্গে সাধারণতঃ যেভাবে সাধনা করা হয় তাহাতে জগৎজীবন হইতে সাধককে দূরে এক সর্ব্বাতিগ বিশ্বাতীত বস্তুতে তদ্‌গত করে, অবশ্য তাহা জ্ঞানমার্গের অদ্বৈতবাদীর কাম্য অবস্থা হইতে ভিন্নপ্রকারের।

কিন্তু এখানেও এই ঐকান্তিক পরিণতি অপরিহার্য্য নহে। কিন্তু এ যোগের মধ্যে এই ঐকান্তিকতার সংশোধক এক প্রাথমিক ব্যবস্থা আছে, কেননা ইহা পরমাত্মা এবং ব্যষ্টিসত্তার সম্বন্ধজনিত দিব্য প্রেমের খেলা শুধু এ-দুয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে নাই, যাহারা এই একই পরমপ্রেম এবং আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য মিলিত হন সেই সমস্ত ভক্তেব সাধারণ অনুভূতি ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের মধ্যেও তাহা বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। সংশোধনের আরও এক সাধারণ ব্যবস্থা এই যে ইহা তাহার দিব্য প্রেমাস্পদকে সর্ব্বসত্তার মধ্যে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছে, মানুষে সীমাবদ্ধ না করিয়া পশুর মধ্যেও সে দিব্যবস্তুকে দেখিতে চাহিয়াছে এবং এই অনুভূতি সহজেই জগতের সমস্ত মূর্ত্ত বস্তুতে প্রসারিত হইয়া পড়িতে পারে। আমরা দেখিতে পাই যে ভক্তি-যোগের এই বৃহত্তর প্রয়োগ এমনভাবে করা যাইতে পারে যে মানুষের ভাবাবেগ

তরের মধ্যে পলায়ন দ্বারা ইহা সম্ভব হইতে পারে এবং তাহাই সাধারণ মতবাদ ; অথবা নিম্নতরকে রূপান্তরিত করিয়া এবং উচ্চতর প্রকৃতির মধ্যে উঠাইয়া দিয়া ইহা সাধিত হইতে পারে। এই পরবর্ত্তী পদ্ধতিই পূর্ণযোগের লক্ষ্য।

কিন্তু যে কোন ক্ষেত্রে হউক না কেন, নিম্নতর প্রকৃতির অন্তর্গত কিছুর মধ্য দিয়াই আমাদিগকে উচ্চতর সত্তায় উঠিতে হইবে, এবং যোগের প্রত্যেক পন্থাই তাহার নিজস্ব স্থান হইতে যাত্রার অথবা তাহর পলায়নেব দ্বার বাছিয়া নেয় : তাহার নিম্নতর প্রকৃতির কোন কোন ক্রিয়াধারাকে বিশেষভাবে কার্য্য-সাধনোপযোগী করিয়া তোলে এবং তাহাদিগকে ভগবানের দিকে ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রকৃতির নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক ক্রিয়ার একটা সর্ব্বাঙ্গীণ গতি আছে যাহাতে আমাদের সত্তার জটিল উপাদানগুলি আমাদের সকল পরিবেশকে প্রভাবিত করে এবং তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমাদের সমগ্র জীবনই প্রকৃতির যোগ। যে যোগ আমরা চাই তাহাকে প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণ ক্রিয়া হইতে হইবে, প্রাকৃত মানুষ এবং যোগীর মধ্যে এই মাত্র পাথক্য থাকিবে যে যোগী ভেদের মধ্যস্থিত অহং ও ভেদ দ্বারা পরি-চালিত নিম্নতর প্রকৃতির সকল কর্ম্মধারার স্থানে পরাপ্রকৃতির পূণ কর্ম্মধারা প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং তাহার সক্রিয়তাব উৎস ও পরিচালক হইবে ভগবান ও তাঁহার একত্ব। কিন্তু বস্তুতঃ যদি জগৎ হইতে ভগবানের নিকট পলায়নই আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে সমন্বয়ের কোন প্রযোজন নাই, তাহার জন্য চেষ্টা করা বৃথা কাল ক্ষয় মাত্র ; কেননা তখন আমাদের কার্য্যকরী উদ্দেশ্য হইবে হাজার পথের মধ্যে সোজাপথগুলির হ্রস্বতমটিকে বাছিয়া নেওয়া এবং অন্য যে সমস্ত পথ সেই একই চরমলক্ষ্যে লইয়া যায় তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিবার জন্য সময়ক্ষেপ না করা। কিন্তু আমাদের সমগ্র সত্তার রূপান্তর সাধন করিয়া ভগবৎ-সত্তায় পরিণত করা যদি উদ্দেশ্য হয় তবে সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে।

তাহা হইলে যে পদ্ধতি আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে তাহা এই যে আমাদের সমগ্র চেতন সত্তাকে ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিতে এবং তাঁহার সংস্পর্শে স্থাপিত করিতে হইবে এবং আমাদের সমগ্র সত্তাকে তাঁহার দিব্য সত্তাতে রূপান্তরিত করিয়া লইবার জন্য তাঁহাকেই আমাদের অন্তরে আবাহন করিতে হইবে, যাহাতে স্বয়ং ভগবান, আমাদের অন্তরস্থ প্রকৃত দিব্য পুরুষ, যেন নিজেই সাধনার সাধক এবং যোগের অধীশ্বর এ উভয়ই হইতে পারেন, যাহাতে তিনি নিজেই আমাদের নিম্নতর ব্যক্তিত্বকে এক দিব্য রূপান্তরের কেন্দ্র এবং তাহার নিজের সিদ্ধির বা পূর্ণতার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন।

বস্তুতঃ দিব্য প্রকৃতির, সদ্ভূত বিজ্ঞানের (**Real Idea**) বা ঋতম্ভরা ভাবনার মধ্যে নিহিত আমাদের অন্তরস্থ তপোবীর্য্য বা চেতনার শক্তি আমাদের অখণ্ড সত্তার উপর কেন্দ্রীভূত প্রভাবের দ্বারা তাহার নিজের সিদ্ধি আনয়ন করে। যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান, যিনি ভগবান তিনিই সীমা ও অন্ধকারের উপর নামিয়া আসেন, সমগ্র নিম্নপ্রকৃতিকে ক্রমশঃ আলোকিত ও বীর্য্যবন্ত করিয়া তোলেন এবং নিম্নতর মানুষী আলোকের ও মর্ত্ত্যক্রিয়ার সকল অবস্থার স্থানে তাহার নিজ ক্রিয়াধারা প্রতিষ্ঠিত করেন।

মনস্তাত্ত্বিক তথ্যের দিক হইতে এই পদ্ধতি হইতেছে অহংকারের পরপারস্থিত এক সদ্বস্তু ও তাহার বিশাল ও অপ্রমেয় কিন্তু সর্ব্বদা অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মধারার নিকট ক্ষুদ্র বিবিক্ত অহং ও তাহার সকল ক্ষেত্র ও যন্ত্রের ক্রমবর্দ্ধমান আত্মসমর্পন। নিশ্চয়ই ইহা সোজা রাস্তা নহে, ইহার সাধনাও সহজ নহে। ইহার জন্য অসীম বিশ্বাস, পরম সাহস এবং সর্ব্বোপরি অবিচলিত ধৈর্য্যের প্রয়োজন। কেননা ইহাতে তিনটি সোপান উপলক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে শুধু শেষটি পূর্ণরূপে আনন্দময় এবং দ্রুত হইতে পারে, সোপান তিনটির প্রথমটি হইল ভগবানের সংস্পর্শে আসিবার জন্য অহংএর প্রযত্ন, দ্বিতীয়টি উচ্চতর প্রকৃতিকে গ্রহণ করিবার এবং তাহা হইয়া উঠিবার জন্য দিব্য কর্ম্মধারা দ্বারা সমগ্র নিম্নতর প্রকৃতিকে উদারভাবে ও পূর্ণরূপে সুতরাং শ্রমসাধ্য উপায়ে প্রস্তুতি, তৃতীয়টি অন্তিম রূপান্তর। বস্তুতঃ কিন্তু দিব্যশক্তি অনেক সময় অলক্ষিত এবং আবরণের পশ্চাতে অবস্থিত থাকিয়া আমাদের দুর্ব্বলতার স্থান অধিকার করে এবং আমাদের বিশ্বাস সাহস এবং ধৈর্য্যের সর্ব্বপ্রকার বিচ্যুতির মধ্য দিয়া আমাদিগকে ধারণ করিয়া থাকে। ইহা "অন্ধকে দর্শনের এবং পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘনের শক্তি" দান করে। বুদ্ধি তখন এক পরমবিধানের কথা জ্ঞাত হয়, যাহা হিতৈষীর মত প্রণোদিত করে, এক সহায়তা দেখিতে পায় যাহা তাহাকে ধারণ করিয়া রাখে ; এবং হৃদয়, যিনি সর্ব্ববস্তুর প্রভু ও মানুষের বন্ধু এমন একজনের অথবা এক জগন্মাতার সন্ধান দেয়, যিনি সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ও পদস্খলনের মধ্য দিয়া আমাদিগকে ধরিয়া রাখেন, সুতরাং এই পথ যত দুরূহ কল্পনা করা যায় তত দুরূহ, তথাপি ইহার বিপুল প্রয়াস ও উদ্দেশ্যের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুনিশ্চিত।

উচ্চতর প্রকৃতি যখন নিম্নতরের উপর পূর্ণভাবে ক্রিয়া করে তখন এই ক্রিয়ার তিনটি প্রধান সুপ্রকাশিত বিশেষত্ব দেখা যায়। প্রথম বিশেষত্ব এই যে বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত অন্যান্য যোগপন্থার মত নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি বা ক্রম-অনুসারে এ যোগশক্তি ক্রিয়া করে না ; কিন্তু যাহার মধ্যে ইহা ক্রিয়া করে তাহার

চেতনা তাহার উপলব্ধির দ্বারা সীমিত হয় না বলিয়া আমরা আনন্দঘন অবস্থার মধ্যে একত্বের এবং প্রেমের মধ্যে সুসমঞ্জস বৈচিত্র্যের অনুভূতি লাভ করি, যাহাতে আমাদের পক্ষে আমাদের সত্তার সুউচচ শিখরে পরম প্রেমাস্পদের সঙ্গে শাশ্বত একত্ব রক্ষা করিয়া তাহার লীলা বা খেলার মধ্যেও সকল সম্বন্ধ বজায় রাখা সম্ভব হয়; অনুরূপভাবে বিস্তার লাভের ফলে যাহা জীবনকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে এবং জগৎ হইতে পলায়নের উপর নির্ভর করে না, অন্তরাত্মার তেমন এক স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমিত্ব, বন্ধন এবং প্রতিক্রিয়াশূন্য হইয়া আমাদের মনে এবং দেহে মুক্তভাবে জগতের উপর প্রবাহিত দিব্যক্রিয়ার প্রণালী হইতে পারি।

দিব্যজীবনের প্রকৃতিতে যে শুধু স্বাধীনতা আছে তাহা নহে কিন্তু শুচিতা পরমানন্দ এবং পূর্ণতাও আছে। পূর্ণাঙ্গ মুক্তির অবস্থা হইল এমন এক সর্ব্বাঙ্গীণ পবিত্রতা যাহা এক দিকে দিব্যপুরুষকে আমাদের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করিতে সমর্থ, অন্যদিকে আমাদের বাহ্য সত্তায় আমরা যে জটিল যন্ত্র তাহার যথাযথ ক্রিয়াধারার মধ্য দিয়া তাঁহার দিব্য সত্য ও বিধানকে জীবনের সকল অঙ্গে পরিপূর্ণভাবে প্রবাহিত করাইয়া দিতে সক্ষম। ইহার ফলে লাভ হইবে এক পরিপূর্ণ আনন্দঘন অবস্থা, যাহাতে জগতে যাহা কিছু আছে তাহার সকলকে দিব্যপুরুষের প্রতীকরূপে দেখিবার আনন্দ এবং যাহা কিছু জাগতিক নয় তাহারও সকল আনন্দ যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিবে। ইহা মানুষী প্রকাশের সকল অবস্থার মধ্যে দিব্যভাবের প্রতিরূপ বা আদর্শে আমাদের মানবজাতিকে সর্ব্বাঙ্গীণ পূণতার জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিবে, যে পূণতা হইবে সত্তা প্রেম আনন্দ ও জ্ঞানের খেলার এবং শক্তির ও নিরহঙ্কার ক্রিয়ার মধ্যে সংকল্পের খেলার একপ্রকার মুক্ত সর্ব্বজনীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। পূর্ণযোগের দ্বারা এই সর্ব্বাঙ্গীণতাও লাভ হইতে পারে।

মন ও দেহের পূর্ণতাও এ-পূণতার অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং মানবজাতিকে সমন্বয়ের যে উদারতম সূত্র অবশেষে লাভ করিতে হইবে, রাজযোগ এবং হঠযোগের উচচতম সিদ্ধিও তাহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। যোগের মধ্য দিয়া মানুষের পক্ষে মন ও দেহের সাধারণ বৃত্তি এবং অনুভূতি সকলের পূর্ণপরিণতি যতটা সম্ভব অন্ততঃ ততটা পূর্ণযোগের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখিতে হইবে। পূর্ণাঙ্গ মানসিক এবং দৈহিক জীবনে যদি তাহারা ব্যবহৃত না হয়, তবে তাহা-দের অস্তিত্বের কোন কারণই থাকে না। তাহার প্রকৃতিতে এরূপ পূর্ণাঙ্গ মানসিক এবং দৈহিক জীবন হইবে, তাহার যথার্থ মনোময় এবং দৈহিক তত্ত্বে আধ্যাত্মিক জীবনের এক অনুবাদ, এক পরিবর্ত্তিত রূপ। এইরূপে আমরা

করিবেন, অতীতের মধ্যে যাহা সর্ব্বোত্তম তাহা দ্বারা ভবিষ্যৎকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন। কিন্তু অবেশষে—অথবা অবশেষে কেন যদি সম্ভব হয় তবে প্রথম হইতেই লিখিত শাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া—'শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে'—সাধককে তাহার নিজের আত্মার মধ্যে সর্ব্বদা বাস করিতে হইবে; তিনি যাহা শুনিয়াছেন বা ভবিষ্যতে শুনিবেন সে-সবকে—শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ—ছাড়াইয়া গিয়া উর্দ্ধে দাঁড়াইতে হইবে কেননা তিনি বিশিষ্ট গ্রন্থ বা গ্রন্থরাজির সাধক নহেন, সাধক তিনি অনন্তের।

আর এক প্রকারের শাস্ত্র আছে যাহা ঠিক ধর্ম্মগ্রন্থ নহে কিন্তু সাধক যে যোগমার্গ অনুসরণ করিতে চায় সে শাস্ত্রে তাহার বিজ্ঞান পদ্ধতি মুখ্যতত্ব ও ক্রিয়াধারার বর্ণনা আছে। প্রত্যেক যোগপন্থাতে এরূপ শাস্ত্র আছে যাহা হয় লিখিত অথবা পরম্পরাগত অর্থাৎ গুরু পরম্পরায় মুখে মুখে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের লোকে সাধারণতঃ এই লিখিত শাস্ত্র অথবা ঐতিহ্য অনুযায়ী শিক্ষাকে প্রামাণিক মনে করে তাহাকে উচচ সম্মান দেয় ও গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে। ধরিয়া নেওয়া হয় যে যোগের সকল সাধন-ধারা নির্দ্দিষ্ট বা নির্দ্ধারিত, আর যে গুরু ঐতিহ্য অনুসারে শাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়াছেন এবং নিজ সাধনার আলোকে তন্মধ্যস্থিত সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই শিষ্যকে চিরন্তন পথে পরিচালিত করিতে পারেন। তাই নূতন সাধনপ্রণালী, যোগের নূতন শিক্ষা বা উপদেশ, যোগের নূতন সূত্র প্রচলনের বিরুদ্ধে এই আপত্তি প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় যে "ইহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে।" কিন্তু যোগীগণের সাধন পথে বস্তুতঃ কিম্বা কার্য্যতঃ নূতন সত্য, নবীন অভিব্যক্তি কিম্বা বিশালতর অনুভূতিকে ভিতরে আসিতে না দেওয়ার জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রবেশদ্বার দৃঢ়ভাবে অর্গলবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই। লিখিত শাস্ত্র বা ঐতিহ্য অনুযায়ী শিক্ষা বহু শতাব্দীর সঞ্চিত সুগঠিত ও সুব্যবস্থিত, নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজলভ্য করিয়া রচিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাই ইহার গুরুত্ব ও উপযোগিতা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু প্রয়োজন মত ইহার কিছু অদলবদল কিম্বা সম্প্রসারণ করিবার পক্ষে কার্য্যতঃ বেশ স্বাধীনতা সর্ব্বদাই রহিয়াছে। এমন কি রাজযোগের মত এত উচচ বৈজ্ঞানিক যোগপদ্ধতিও পতঞ্জলির সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার স্থানে অন্য ধারাতে অভ্যাস করা যায়। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম এই ত্রিমার্গের প্রত্যেকে বহু উপপথে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারা সকলে আসিয়া পুনরায় এক শেষ গম্য স্থানে মিলিত হইয়াছে। যে সাধারণ জ্ঞানের উপর যোগ নির্ভর করে তাহা নির্দ্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত কিন্তু তাহার ব্যবস্থা, অনুক্রম, প্রণালী ও রূপের কতকটা

অদলবদল করিয়া নিতেই হয়; কেননা মূল সত্যসকলকে দৃঢ় ও অচল রাখিয়াও ব্যক্তিগত প্রকৃতির প্রয়োজন এবং বিশেষ প্রবৃত্তিরাজির পরিতৃপ্তি সাধন করিতে হইবে।

সমন্বয়মূলক পূর্ণযোগের পক্ষে লিখিত বা পরম্পরাগত কোন শাস্ত্রের গণ্ডির মধ্যে বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকিবার প্রয়োজন নাই; কেননা এ যোগ অতীতের জ্ঞানকে সাদরে গ্রহণ করিলেও তাহাকে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়। ইহার আত্মরূপায়ণের বিধান হইবে আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভ এবং লব্ধ জ্ঞানকে নূতন ভাষায় এবং নূতন যোজনায় পুনর্বর্ণন করিবার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। সমগ্র জীবনকে আলিঙ্গন ও নিজের মধ্যে গ্রহণ করা এ যোগের লক্ষ্য বলিয়া ইহার সাধক তীর্থযাত্রীর মত রাজপথ ধরিয়া যে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবে একথা বলা চলে না বরং বলিতে হয় দুর্ভেদ্য জঙ্গল কাটিয়া তাহাকে নিজের পথ নিজে প্রস্তুত করিয়া লইয়া চলিতে হইবে। কারণ বহুকাল হইতে যোগ বাস্তব জীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে; আমাদের বৈদিক পিতৃপুরুষগণ দ্বারা আচরিত সাধনপন্থার মত যে সমস্ত যোগপ্রণালী একদিন আমাদের জীবনকে অধিকার করিতে চাহিয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে আমরা অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছি, সে সমস্ত যে ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে এখন আর আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না, যেরূপে তাহাদের প্রয়োগ হইত বর্তমানে তাহা আর চলে না। শাশ্বত কালের স্রোতে মানুষ অনেক অগ্রসর হইয়াছে এবং পূর্ব্বের সেই এক সমস্যাই সমাধানের চেষ্টা নূতন দিক হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে।

এই যোগদ্বারা আমরা যে কেবল অনন্তকে খুঁজিতেছি তাহা নয় পরন্তু আমরা মানবজীবনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে আবাহনও করিতেছি। তাই আমাদের যোগের শাস্ত্র এরূপ হওয়া প্রয়োজন যে তাহাতে নব নব আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণক্ষম মানবাত্মাকে অব্যাহত স্বাধীনতা দিবার ব্যবস্থা থাকিবে। বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত পুরুষকে নিজস্ব ধরণে ও নিজস্ব ধারায় আপনার মধ্যে গ্রহণ করিবার কর্ম্মে প্রত্যেকের অবাধ স্বাধীনতা থাকিবে, ইহাই মানুষের পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনের যথার্থ বিধান। এই সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে ক্রমবর্দ্ধমান নানা বৈভব ও রূপবৈচিত্র্যের দ্বারাই সকল ধর্ম্মের অখণ্ড একত্ব অপরিহার্য্যরূপে প্রকাশ পায়, আর ধর্ম্মের মূলগত একত্বের পরিপূর্ণ অবস্থা তখনই দেখা দিবে যখন প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব এক ধর্ম্ম থাকিবে, যখন মানুষ ধর্ম্মের সম্প্রদায় কিম্বা পরম্পরাগত রূপের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাহার আপন প্রকৃতির স্বাধীন

নির্দ্দেশ অনুসারে পরমপুরুষের সহিত তাহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করিবে। তদ্রূপ ইহা বলা যায়, যে পূর্ণযোগের পূর্ণতা ও সিদ্ধি তখনই আসিবে যখন প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজস্ব যোগপন্থা অনুসরণ করিতে পারিবে, যখন অপরা-প্রকৃতির উর্দ্ধে যে পরতত্ত্ব আছে তাহার দিকে তাহার স্বভাবের উৎক্রান্তির অনুসরণ করিয়া পরিণতির পথে সে অগ্রসর হইবে। কারণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতাই চরম বিধান ও শেষ পরিণতি।

তবু ইতিমধ্যে কয়েকটি সাধারণ ধারা গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে যাহা সাধকের ভাবনা ও সাধনার পথ দেখাইতে সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু বাঁধাধরা কার্য্যক্রমের তালিকার মত যাহাকে অনুসরণ করিতে হইবে এমন নির্দ্দিষ্ট কোন রীতি বা প্রণালী না হইয়া যতদূর সম্ভব সে ধারাগুলি হইবে সর্ব্ব-জনীন সত্যরাজির রূপ ও মূল তত্ত্বের সাধারণ বিবৃতি এবং সাধকের প্রচেষ্টা ও পরিণতির জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী ও উদার ব্যবস্থা। সকল শাস্ত্রই অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে জাত এবং ভবিষ্যৎ অনুভূতির সহায় ও আংশিক পথপ্রদর্শক। শাস্ত্র পথনির্দ্দেশক স্তম্ভের কাজ করে, যে স্তম্ভে প্রধান রাস্তাগুলির নামোল্লেখ থাকে, আর থাকে যেপথ ইতিপূর্ব্বেই পর্য্যটন ও পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে তাহার দিগ্‌দর্শন, যাহাতে পর্য্যটক কোন্ দিকে এবং কোন্ পথে চলিতেছে তাহা জানিতে পারে।

আর বাকিটা নির্ভর করে সাধকের প্রযত্ন ও অনুভূতি এবং গুরু-শক্তির উপর।

যোগ সাধনার প্রারম্ভে এবং তাহার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত অনুভূতির ক্রমবিকাশ কত দ্রুত হইবে তাহার পরিমাণ গভীরতা ও শক্তি কিরূপ হইবে, তাহা প্রধানতঃ সাধকের আস্পৃহা ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করিবে। যোগসাধনার অর্থ বস্তুর বাহ্যরূপে ও আকর্ষণে অভিনিবিষ্ট অহংগত চেতনা হইতে মানবাত্মার এক উচ্চতর অবস্থার দিকে ফিরিয়া দাঁড়ানো, যে অবস্থার মধ্যে বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত সত্তা ব্যক্তিগত আধারে আপনাকে ঢালিয়া দিয়া তাহার রূপান্তর সাধন করিতে পারেন। প্রথম দিকে সিদ্ধি নির্ভর করে এই ভাবে ফিরিয়া দাঁড়ানোর তীব্রতার উপর আর যাহা আত্মাকে অন্তর্মুখী করিয়া দিবে সেই শক্তির উপর। এই তীব্রতার পরিমাপ হইবে সাধকের হৃদয়ের আস্পৃহা কতটা শক্তিমান হইয়াছে, তাহার সংকল্পের কতটা সামর্থ্য জন্মিয়াছে, মনে কতটা একাগ্রতা জাগিয়াছে, কতটা ধৈর্য্য ও কতটা দৃঢ়তা লইয়া সাধক

লাভের পরম অবস্থা। বিশ্বে প্রকট জীব বা ব্যষ্টি-আত্মা সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা, শান্তি ও শক্তি, একত্ব ও বহুত্বের সকল অনুভূতিতে তাঁহাকে ভোগ করিবার আনন্দকেই অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ইহাই পূর্ণ যোগের লক্ষ্যের পূর্ণ বিবরণ—বিশ্বপ্রকৃতি যে সত্যকে নিজের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছে আবার যাহাকে আবিষ্কার করিবার জন্য এত শ্রম বেদনা স্বীকার করিতেছে সেই সত্যকে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আনয়ন করাই সে লক্ষ্য; সে লক্ষ্য মানবাত্মাকে দিব্য-আত্মাতে এবং প্রাকৃত জীবনকে দিব্য জীবনে রূপান্তরিত করা।

* * *

এই সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধিতে পৌঁছিবার সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য পন্থা হইল যিনি আমাদের অন্তরের অধিবাসী ও সকল রহস্যের অধীশ্বর তাঁহার অনুসন্ধান করা, যিনি দিব্যজ্ঞান ও দিব্যপ্রেমস্বরূপ সেই ভাগবত শক্তির কাছে সর্ব্বদা আপনাকে খুলিয়া ধরা এবং আমাদের রূপান্তর সাধনের জন্য তাঁহারই উপর নির্ভর করা। কিন্তু আমাদের অহংগত চেতনার পক্ষে প্রারম্ভে ইহা করা সুকঠিন। আর যদি বা সম্ভব হয় তবু পুর্ণভাবে এবং আমাদের প্রকৃতির প্রত্যেক তন্ত্রীতে তাহা সাধনকরা আরো কঠিন। ইহা কঠিন এজন্য যে প্রথমতঃ আমাদের ভাবনা ইন্দ্রিয়সংবেদন এবং হৃদয়াবেগের অহংগত অভ্যাসগুলি প্রয়োজনীয় অনুভূতিতে পৌঁছিবার পথ বন্ধ করিয়া রাখে। পরেও ইহা কঠিন, কেননা এই পথে চলিতে যে-শ্রদ্ধা যে-সমর্পণ ও যে-নির্ভীকতা প্রয়োজন অহংকারের মেঘে আচ্ছন্ন আমাদের অন্তরাত্মার পক্ষে তাহা সহজ সাধ্য নহে। অহংগত মন দিব্যকর্ম্মধারা চায় না, তাহাকে অনুমোদন করে না, কেননা সে মন সত্যে পৌঁছিবার জন্য ভ্রমকে, আনন্দে পৌঁছিবার জন্য দুঃখকে, পূর্ণতায় পৌঁছিবার জন্য অপূর্ণতাকে ব্যবহার করে। কোথায় সে পরিচালিত হইতেছে অহমিকা তাহা দেখিতে পায় না; পরিচালনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, বিশ্বাস ও সাহস হারায়। কিন্তু আমাদের এ সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতিতে কিছু আসে যায় না, কেননা অন্তর্য্যামী দিব্যগুরু আমাদের বিদ্রোহে বিরক্ত, আমাদের বিশ্বাস-হীনতায় হতাশ বা আমাদের দুর্বলতায় আমাদের প্রতি বিমুখ হন না; তাঁহার মধ্যে আছে মাতার পরিপূর্ণ স্নেহ ও শিক্ষকের অসীম ধৈর্য্য। কিন্তু সে পরি-চালনা হইতে আমাদের সম্মতি যদি অপসারিত করিয়া লই তাহা হইলে তাহার অনুগ্রহ ও উপকারের চেতনা আমরা হারাইয়া বসি, কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা হইতে যাহা লাভ করিতেছি তাহার সবটাই, অন্ততপক্ষে তাহার শেষ পরিণতি আমাদের পক্ষে নষ্ট হয় না। আমরা আমাদের সম্মতি অপসারিত করিয়া লই

তাহার কারণ এই যে আমাদের উচচতর সত্তাকে আমাদের নিম্নতর সত্তা হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে শিখি নাই, বুঝি না যে অধস্তনের মধ্য দিয়াই ঊর্দ্ধ্বতনের আত্মপ্রকাশের প্রস্তুতি চলিতেছে। যেমন জগতে তেমনি আমাদের নিজেদের মধ্যে আমরা ভগবানকে দেখিতে পাই না, কেননা তিনি তাঁহার নিজের কর্ম্মের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, আর বিশেষতঃ দেখিতে পাই না এইজন্য যে তিনি আমাদের প্রকৃতির মধ্য দিয়াই আমাদের ভিতরে কাজ করেন—যথেচ্ছভাবে, অলৌকিক ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়া নহে। অতিপ্রাকৃত ঘটনা না দেখিলে মানুষের বিশ্বাস জন্মে না, কোন বস্তু হইতে চোখ-ঝলসানো আলোক না পাইলে সে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিতে চায় না। এই অধৈর্য্য এই অজ্ঞান বিপুল বিপত্তি ও মহা অনর্থ হইয়া দাঁড়াইতে পারে, যদি আমরা দিব্য পরিচালনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া আমাদের আবেগ ও বাসনাসকলের পক্ষে তৃপ্তিকর, বিকৃতির জনক অন্য কোন শক্তিকে ডাকিয়া আনি এবং যদি দিব্য শক্তি নাম দিয়া তাহাকেই আমাদের পরিচালকের পদে অভিষিক্ত করি।

মানুষের পক্ষে তাহার নিজের মধ্যস্থিত অদৃশ্য কোন কিছুকে মানিয়া নেওয়া কঠিন কিন্তু নিজের বাহিরে যাহা দৃশ্যমান তেমন কিছুকে বিশ্বাস করা তাহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। অধিকাংশ মানুষের আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য বাহ্য অবলম্বনের কোন বস্তু, আমাদের বাহিরে অবস্থিত ভক্তি ও বিশ্বাসের কোন পাত্রের প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরের কোন বাহ্য প্রতিরূপ কিম্বা তাহার কোন মানব প্রতিভূ, কোন অবতার, কোন মহাপুরুষ বা গুরু, তাহার পক্ষে প্রয়োজন, অথবা সে প্রতিরূপ ও প্রতিভূ উভয়কেই চায় এবং উভয়কেই পায়। কেননা মানবাত্মার প্রয়োজন অনুসারে ভগবান কখনও দেবতারূপে কখন দিব্য মানবরূপে কখনও বা সাধারণ মানুষরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, তাহার পরিচালন শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য এমন এক নিবিড় ছদ্মবেশ ধারণ করেন যাহা ভগবত্তাকে সম্পূর্ণরূপে লুকাইয়া রাখে।

অন্তরাত্মার এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য হিন্দুর আধ্যাত্মিক সাধনায় ইষ্টদেবতা, অবতার ও গুরুর স্থান দেওয়া হইয়াছে। মনোনীত দেবতা বা ইষ্টদেবতা অর্থ কোন নিম্নতর শক্তি নহে তাহা বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত ঈশ্বরের কোন নাম ও রূপ। প্রায় সকল ধর্ম্মই ভগবানের এইভাবের নাম ও রূপ ব্যবহার করে অথবা তাহাদের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে। মানবাত্মার পক্ষে এই ব্যবস্থার প্রয়োজন সুস্পষ্ট। ঈশ্বর সর্ব্ব এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কিছু। কিন্তু যাহা সর্ব্বের অপেক্ষা অধিক মানুষ তাহার ধারণা কিরূপে করিবে? এমন কি প্রারম্ভে সর্ব্বের ধারণা করাও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য; কেননা তাহার সক্রিয়

মনের উপর নিষ্ক্রিয়ভাবে স্বীকার করিবার জন্য নিজেকে অথবা নিজের মতামতকে চাপাইয়া দিবেন না ; যাহা নিশ্চিতরূপে ফলোৎপাদক তেমন বীজ শুধু তিনি শিষ্য-হৃদয়ে বপন করিবেন, আর শিষ্যের অন্তরস্থ দিব্যপুরুষের পরিপোষণের ফলে তাহা বাড়িয়া উঠিবে। তিনি শিষ্যকে যতটা উপদেশ দিবেন তদপেক্ষা অধিকতরভাবে তাহাকে জাগাইয়া তুলিতে চাহিবেন ; তাহার উদ্দেশ্য হইবে স্বাভাবিকভাবে স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়া শিষ্যের বৃত্তিসকল ও অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশ। তিনি সহায়ক ও ব্যবহারোপযোগী উপায়রূপে প্রণালী বা পদ্ধতি শিক্ষা দিবেন বটে কিন্তু অলঙ্ঘনীয় সূত্র বা দৃঢ়বদ্ধ কার্য্যতালিকা হিসাবে নহে। কিন্তু সাধনোপায় সীমা ও বন্ধনে, সাধন পদ্ধতি যান্ত্রিক অনুষ্ঠানে পরিণত না হয় সে বিষয়ে তাহাকে সর্ব্বদা সাবধান হইতে হইবে। তিনি নিজে যে পরম শক্তির করণ ও সহায়, আধার ও প্রণালী মাত্র, সেই দিব্য জ্যোতিকে জাগাইয়া তোলা, সেই দিব্য-শক্তিকে কাজে লাগানোই হইবে তাহার সমগ্র কর্ম্ম।

উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণের শক্তি বেশী ; কিন্তু বাহ্যক্রিয়া বা ব্যক্তিগত চরিত্রের উদাহরণই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু তাহা নহে। অবশ্য সেরূপ উদাহরণেরও স্থান ও উপযোগিতা আছে ; কিন্তু যাহা অপরের মধ্যে আস্পৃহার বহ্নি সর্ব্বাধিক পরিমাণে জাগাইয়া তুলিবে তাহা হইল গুরুর মধ্যে সেই ভাগবত উপলব্ধি যাহা তাহার সত্তার মুখ্য তথ্য হইয়া উঠিয়া তাহার সমগ্র জীবন আন্তর সত্তা এবং তাহার সকল কর্ম্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ইহাই সার্ব্বভৌম মূল বস্তু ; বাকি সব কিছু ব্যষ্টি-ব্যক্তি ও ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। সাধককে এই জাগ্রত সক্রিয় উপলব্ধি পাইতে এবং নিজ প্রকৃতি অনুসারে তাহাকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে হইবে ; বাহির হইতে অনুকরণের চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই, তাহা যথাযথভাবে স্বাভাবিক ফল না ফলাইয়া বরং অফলপ্রসূ হইয়া পড়িতে পারে।

উদাহরণ অপেক্ষা প্রভাব আরও অধিক প্রয়োজনীয়। প্রভাব অর্থ শিষ্যের উপর গুরুর বাহ্য শাসন নয়, যথার্থ প্রভাব হইল গুরুর সান্নিধ্য ও সংস্পর্শের এবং তাহার আত্মার সান্নিধ্যের শক্তি, যাহার ফলে নীরবতার মধ্য দিয়া হইলেও গুরু নিজে যাহা এবং যাহা কিছু তাহার আছে তাহা শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। ইহাই গুরুর চরম চিহ্ন। কেননা শ্রেষ্ঠ গুরু যতটা শিক্ষক তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে এমন একটা সদ্ভাব বা সান্নিধ্য যাহা তাঁহার চারিদিকে অবস্থিত গ্রহণক্ষম সকল ব্যক্তির মধ্যে দিব্য চেতনা এবং তাহার উপাদানীভূত আলোক, শক্তি, শুদ্ধি ও আনন্দ ঢালিয়া দেয়।

আমাদের অপ্রবুদ্ধ ইন্দ্রিয়মানসের নিকট জগৎ ও তন্মধ্যস্থ বস্তুরাজি হইতে এত অধিক পরিমাণে ন্যূনতর বাস্তব বলিয়া মনে হয়। আমাদের সমগ্র সত্তা—আত্মা মন ইন্দ্রিয় হৃদয় ইচ্ছা প্রাণ দেহ—সকলকেই নিজ নিজ সমগ্র শক্তি এরূপ পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ করিতে হইবে যাহাতে এই সত্তা দিব্যপুরুষের যোগ্য আধার হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু ইহা সহজসাধ্য নহে, কেননা জগতে প্রতি বস্তুই নির্দ্ধারিত নির্দ্দিষ্ট অভ্যাসের দাস, এরূপ হওয়াই তাহার পক্ষে বিধি এবং এই অভ্যাস আমূল রূপান্তরের বিরোধী। পূর্ণযোগ জীবনে যে বিপ্লব আনিতে চেষ্টা করে অন্যকিছু তদপেক্ষা অধিকতর আমূল রূপান্তর হইতে পারে না। আমাদের মধ্যের প্রত্যেক তত্ত্ব প্রত্যেক বৃত্তিকে সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে তাহারা কেন্দ্রগত বিশ্বাস সংকল্প ও দৃষ্টিকে যেন না ছাড়ে। প্রত্যেক ভাবনা প্রত্যেক প্রেরণাকে উপনিষদের ভাষায় মনে করাইয়া দিতে হইবে যে "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে"—'তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, মানুষ এখানে যাহাকে উপাসনা করে, তাহাকে নয়'; প্রাণের প্রত্যেক তন্তুতে প্রতীতি জন্মাইতে হইবে যে এতকাল যাহাকে তাহার আপন সত্তা বলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছে এখন তাহা পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। মন আর মন থাকিবে না, তাহাকে মনের অতীত কিছু দ্বারা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে হইবে। জীবনকে এমন একটা বিশাল ও শান্ত, তীব্র ও শক্তিমান বস্তুতে পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে যে সে তাহার পুরাতন অন্ধ অধীর সংকীর্ণ সত্তা বা ক্ষুদ্র বাসনা ও আবেগ সকলকে আর চিনিতেই পারিবে না। এমন কি দেহকেও রূপান্তর স্বীকার করিতে হইবে, সে আর বর্ত্তমানের মত বাসনা-তাড়িত সনির্ব্বন্ধ পশু বা প্রতিরোধকারী মৃৎপিণ্ড থাকিবে না কিন্তু তাহার স্থানে চিৎ-পুরুষের সচেতন সেবক, প্রদীপ্ত যন্ত্র ও জীবন্ত রূপ হইয়া দাঁড়াইবে।

কাজ এত কঠিন বলিয়াই স্বাভাবিকভাবে লোকে এক সহজ সমাধান বাহির করিতে এবং গ্রন্থি খুলিতে না পারিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে; ইহা হইতেই ধর্ম্ম ও যোগপন্থাসমূহের পক্ষে আন্তর জীবন হইতে বাহ্য জাগতিক জীবনকে পৃথক করিবার প্রবৃত্তি জাত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছে। তাহারা অনুভব করিয়াছে যে এই স্থূল জগতের শক্তিরাজি ও ক্রিয়াবলির সহিত ভগবানের আদৌ কোন সম্বন্ধ নাই, এ সমস্ত মায়ার বা অন্য কাহারও অন্ধকারাচ্ছন্ন ও হতবুদ্ধিকর ব্যাপার এবং দিব্যসত্যের বিরোধী বস্তু। দেখা যায় যে ইহাদের বিপরীত দিক্‌বর্ত্তী সত্যের শক্তিরাজি ও তাহাদের আদর্শ ক্রিয়াবলি চেতনার সম্পূর্ণ অন্য এক ভূমিতে অবস্থিত; যে চেতনার উপর জাগতিক জীবন প্রতিষ্ঠিত, যাহা অন্ধকার ও অবিদ্যাচ্ছন্ন, যাহার আবেগ ও সামর্থ্য বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে

আছেন। জীবন দিব্যপ্রকাশের এক ক্ষেত্র, যদিও সে প্রকাশ এখনও অপূর্ণ ; আমরা চাই এখানে, এই পৃথিবীর বুকে জীবন ও দেহের মধ্যেই উপনিষদের ভাষায় 'ইহৈব', আবরণ উন্মোচন করিয়া সেই পরম-দেবতাকে প্রকট করিতে ; আমাদিগকে তাহার বিশ্বাতীত মহত্ত্ব জ্যোতি ও মাধুর্য্য আমাদের চেতনায় সত্য করিয়া তুলিত হইবে, এখানেই তাহাকে লাভ করিতে এবং যতদূর সম্ভব প্রকাশ করিতে হইবে। তাই আমাদের যোগে সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধনের জন্য জীবনকে আমরা স্বীকার ও গ্রহণ করিব ; এই স্বীকার ও গ্রহণের ফলে যে সমস্ত বাধা আসিয়া আমাদের সাধন-সমরকে তীব্রতর করিয়া তুলিবে তাহাদিগকে এড়াইয়া চলা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু আমাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে, এ পথ যদিও অধিকতর দুর্গম ও দুরারোহ যদিও আমাদের প্রচেষ্টা আরও জটিল এবং অত্যন্ত শ্রমসাধ্য হইবে তথাপি কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর একটা সময় আসিবে যখন আমরা প্রচুর পরিমাণে অনুকূল অবস্থা লাভ করিব। কেননা একবার আমাদের মন কেন্দ্রগত পরিকল্পনায় সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ হইলে এবং আমাদের সকল সংকল্প মোটের উপর একমুখী হইয়া উঠিলে জীবনই আমাদের সহায় হইয়া দাঁড়াইবে। একাগ্রচিত্ত সতর্ক এবং সর্ব্বাঙ্গীণরূপে সচেতন হইলে, প্রাণের প্রতি রূপ প্রতি ঘটনা আমাদের অন্তরের হোমাগ্নির হবিরূপে অর্পণ করিতে পারিব। যুদ্ধে জয়ী হইলে পৃথিবীকে পর্য্যন্ত আমাদের সিদ্ধির সহায় হইতে বাধ্য করিব, এমন কি বিরোধী শক্তিরাজির ঐশ্বর্য্য অধিকার করিয়া আমরা আমাদের উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করিতে পারিব।

আর একটা দিক আছে যেখানে সাধারণ যোগী সাধনপন্থাকে সংকীর্ণ কিন্তু সহায়করভাবে সরল করিয়া লইয়াছে কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা সাধনের ইচ্ছুক পূর্ণযোগীর পক্ষে সে পথ নিষিদ্ধ। যোগের সাধনায় আমাদের সম্মুখে আমাদের নিজ সত্তারই অসাধারণ জটিলতা, উদ্দীপক অথচ বিব্রতকারী আমাদের বহু ব্যক্তিত্ব, প্রকৃতির সমৃদ্ধ অন্তহীন বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত হয়। যে সাধারণ মানুষ শুধু জাগ্রত বহির্ম্মুখী চেতনার মধ্যে বাস করে, আবরণের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন আত্মার গভীর বিরাট স্বরূপ দেখিতে পায় না, তাহার নিকট তাহার মনোময় জীবন বেশ সহজ ও সরল। সনির্ব্বন্ধ কিন্তু অল্পসংখ্যক বাসনা, বুদ্ধি রুচি ও রসচেতনার কয়েকটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অসম্বদ্ধ বাঅর্দ্ধসম্বদ্ধ বহুল পরিমাণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবনার প্রবল স্রোতের মধ্যে দুই চারিটি প্রভাবশালী ও সুস্পষ্ট ভাব বা ধারণা, অল্পবিস্তরভাবে অবশ্যপালনীয় কয়েকটি প্রাণের দাবী,

স্বাস্থ্য ও রোগের পর্য্যায়ক্রমে আগমন, সুখ ও দুঃখের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং অসম্বদ্ধ পৌর্ব্বাপর্য্য, দেহ বা মনের মধ্যে সর্ব্বদা সংঘটিত নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষোভ ও বিপর্য্যয় আবার তাহার মধ্যে কদাচ কখন ঊর্দ্ধ্বাভিমুখী প্রবল জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধান এবং উৎক্ষেপের আবির্ভাব,—এই সকল বিচিত্র বস্তুর মধ্য দিয়া, অংশত মানুষের ভাবনা ও সংকল্পের সাহায্যে, অংশত তাহাদের সাহায্য না লইয়া অথবা তাহাদের বাধাসত্ত্বেও প্রকৃতি একটা মোটামুটি কাজ চলা গোছের ব্যবস্থায়, বিশৃঙ্খলায় ভরা মোটামুটি একপ্রকার শৃঙ্খলা গড়িয়া তুলিতেছে—ইহাই হইল সাধারণ মানব-জীবনের উপকরণ। পূর্ব্বগত আদিম মানুষ তাহার বাহ্য জীবনে যেরূপ স্থূল ও অপরিণত ছিল, আজকালকার দিনে সাধারণ মানুষ তাহার আন্তর জীবনে তেমনি স্থূল ও অপরিণত রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন আমরা অন্তরের গভীরে প্রবেশ করি,—আর যোগের অর্থই অন্তরাত্মার বিচিত্র গভীরতার মধ্যে নিমজ্জন—তখন মানুষ তাহার পরিণতি পথে পূর্ব্বে যেমন বাহিরের বস্তুরাজির দ্বারা নিজেকে পরিবৃত দেখিত, তেমনি আমরা অন্তরের ক্ষেত্রে দেখিতে পাইব যে আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া আছে এক জটিল জগৎ, যে জগৎকে আমাদের জানিতে ও জয় করিতে হইবে।

আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয় যখন আমরা আবিষ্কার করি যে আমাদের সত্তার বিভিন্ন অঙ্গের প্রত্যেকের, বুদ্ধি সংকল্প বা ইন্দ্রিয়-মানসের, স্নায়বিক বা বাসনাময় সত্তার, হৃদয় ও দেহের যেন অন্য নিরপেক্ষ নিজস্ব একটা জটিল ব্যক্তিত্ব একটা নিজস্ব স্বাভাবিক রূপায়ণ আছে ; ইহাদের কাহারও বনিবনাও হয় না নিজের সঙ্গে বা অপরের সঙ্গে অথবা প্রতিনিধিস্থানীয় সেই অহংএর সঙ্গে যে অহং বহিঃস্থিত অজ্ঞানের উপর কেন্দ্রীয় এবং কেন্দ্রীকরণকারী কোন সত্তার দ্বারা নিক্ষিপ্ত একটা ছায়া। আমরা দেখিতে পাই যে আমরা প্রত্যেকে এক নয় বহু ব্যক্তিত্বের সমাবেশে গঠিত ; আবার এই বহুর প্রত্যেকের প্রকৃতি বিভিন্ন, প্রত্যেকের আছে নিজস্ব পৃথক দাবী। আমাদের সত্তা বর্ত্তমানে স্থূলভাবে গঠিত এক বিশৃঙ্খলা মাত্র, যাহার মধ্যে আমাদিগকে দিব্য শৃঙ্খলার এক তত্ত্ব আনয়ন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, যেমন বাহিরের ঠিক তেমনিভাবেই অন্তরের ক্ষেত্রে জগতের কোথাও আমরা এক নহি ; আমাদের অহং নিজেকে প্রখরভাবে যে অপর হইতে বিভিন্ন মনে করে তাহা একটা প্রবল অধ্যাস, একটা ভ্রান্তি ; আমরা আপনাতে আপনি বাস করি না, বস্তুতঃ অপর সকল হইতে পৃথক হইয়া অন্তরের নিরালায় একাকী থাকি না। আমাদের মন একটা যন্ত্র, ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে যাহার মধ্যে এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতেছে, যে

পূর্ণতার সহিত করিতে হইবে, একটি ক্ষুদ্র কণা একটি সূত্র বা একটিমাত্র স্পন্দনকেও বাদ দেওয়া চলিবে না, কোথাও লেশমাত্র অপূর্ণতা থাকিতে পারিবে না। তাহার জটিল কর্ম্মে একটি বিশেষ বৃত্তিতে ঐকান্তিক অভিনিবেশ অথবা পর্য্যায়ক্রমে একটির পর অন্য বৃত্তিতে সেইভাবে অভিনিবেশ শুধু সাময়িক সুবিধার জন্য সে অবলম্বন করিতে পারে ; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহার উপযোগিতা শেষ হইবে তখনই তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। সর্ব্বাবগাহী এক একাগ্রতা-সাধনরূপ দুরূহ ও বীরোচিত এক কর্ম্ম আছে, পূণযোগের সাধককে সেই কর্ম্মেই অভিনিবিষ্ট হইতে হইবে।

যে কোন যোগে মনের একাগ্রতাই হইল প্রথম অবশ্য সাধনীয় কার্য্য, কিন্তু সর্ব্বগ্রাহী ও সর্ব্বালিঙ্গনকারী এক একাগ্রতা সাধন পূর্ণযোগের বিশিষ্ট প্রকৃতি। ইহাতে সন্দেহ নাই যে এ যোগেও বিশেষ বিশেষ ভাবে ধারণা, বস্তু, অবস্থা, আন্তর গতিবৃত্তি বা তত্ত্বের উপর, ভাবনা আবেগ বা সংকল্পের উপর স্বতন্ত্র সুদৃঢ় অভিনিবেশ, অনেক সময়েই প্রয়োজন ; কিন্তু সে অভিনিবেশ সাধনার একটা গৌন সহায়মাত্র। অতিবিস্তৃতভাবে পূর্ণরূপে নিজেকে খুলিয়া দিয়া যিনি সর্ব্ব হইয়াও এক সেই পরমাত্মার উপর আমাদের সমগ্র সত্তা ও তাহার শক্তিরাজির সর্ব্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস অভিনিবেশই হইল এ যোগের বৃহত্তর ক্রিয়া-ধারা এবং ইহা ছাড়া এ যোগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কেননা যাহা পরম একের মধ্যে বাস এবং সর্ব্বের মধ্যে ক্রিয়া করে সেই চেতনাই আমাদের আস্পৃহার বস্তু ; আমাদের সত্তার প্রতি উপাদানের, আমাদের প্রকৃতির প্রতি বৃত্তির উপর আমরা সেই চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। এই বিশাল ও ঘনীভূত সমগ্রতাই এ সাধনার মূল প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতিই ইহার সাধন প্রণালী নিরূপিত করিবে।

কিন্তু যদিও সমগ্র সত্তাকে ভগবানে অভিনিবিষ্ট করা এ যোগের স্বরূপ, তথাপি আমাদের সত্তা এত বিপুল জটিলতায় ভরা যে একাজ সহজে বা অবিলম্বে সাধিত হইতে পারে না, এ যেন গোটা পৃথিবীকে দুইহাতে গ্রহণ করিয়া তাহাকে সমগ্রভাবে একটিমাত্র কাজে লাগানো। মানুষের নিজেকে অতিক্রম করিবার সাধনায় সাধারণত জটিল যন্ত্রস্বরূপ তাহার প্রকৃতির কোন একটা চালনাকারী বৃত্তি কোন একটি স্প্রিং (**spring**) বা কোন একটি শক্তিশালী লেভার (**lever**) তাহাকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিতে হইবে ; যন্ত্রের সকল অঙ্গের মধ্য হইতে এই স্প্রিং বা লেভারকে সে বাছিয়া লইবে এবং তাহার সাহায্যে যন্ত্রটিকে আপন

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম্মে আত্মসমর্পণ—গীতার পন্থা

জীবন, একমাত্র এই জীবনই আমাদের যোগের ক্ষেত্র, সুদূর নীরব অতি উর্দ্ধ স্থিত পরমানন্দময় বিশ্বাতীত কোন তত্ত্ব নয়। এ যোগের মূল উদ্দেশ্য আমাদের বাহ্য সংকীর্ণ এবং পরস্পরের সহিত অসম্বদ্ধ খণ্ডীকৃত মানবীয় চিন্তাধারা দৃষ্টি অনুভূতি ও সত্তাকে এক গভীর ও উদার আধ্যাত্মিক চেতনাতে রূপান্তরিত করা, বাহ্য ও আন্তর জীবনকে সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা, এবং আমাদের সাধারণ মানুষী জীবনধারাকে দিব্য জীবনধারায় পরিণত করা। এই পরম লক্ষ্য সাধনের উপায় ভগবানের চরণে আমাদের সমগ্র প্রকৃতির আত্মসমর্পণ। আমাদের অন্তরস্থ ভগবানকে, সর্ব্বব্যাপী বিশ্বপুরুষকে, সর্ব্বাতীত পরমপুরুষকে সব কিছু সমর্পণ করিতে হইবে। আমাদের সকল সংকল্প হৃদয় ও ভাবনা, যিনি এক ও বহু উভয়রূপে বর্ত্তমান সেই ভগবানের উপর একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট করিতে, আমাদের সমগ্র সত্তা নিঃশেষে একমাত্র তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দিতে হইবে—ইহাই হইল যোগের পথে প্রথম নিশ্চিত পদক্ষেপ, অহমিকাকে তাঁহারই দিকে ফিরানো যাহা তাহার চেয়ে অনন্তগুণে বৃহত্তর, ইহাই হইল আত্মদান, অবশ্যকরণীয় আত্মসমর্পণ।

মানুষ সাধারণতঃ যে জীবন যাপন করে তাহা অতি অপূর্ণভাবে সংযমিত ভাবনা ধারণা ইন্দ্রিয়ানুভূতি আবেগ বাসনা সম্ভোগ ও ক্রিয়ার আধা কঠিন আধা তরল সংমিশ্রণের এক সংঘাত; এই সমস্ত বৃত্তি প্রধানতঃ গতানুগতিক ও পুনরাবৃত্তিপরায়ণ, কেবল আংশিকভাবে সক্রিয়রূপে আত্মপরিণতিশীল, আর ইহারা সকলেই বহিশ্চর এক অহমিকাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। এই সমস্ত গতি ও ক্রিয়ার সমষ্টিগত ফলে অন্তরের একটা পরিণতি ঘটে, যাহা অংশতঃ পরিদৃশ্যমান এবং এই জীবনেই কার্য্যকরী আবার অংশতঃ যাহা পরবর্ত্তী জন্মসকলের মধ্যে প্রগতির বীজস্বরূপ। চেতন সত্তার এই প্রবৃদ্ধি ও প্রসার, ক্রমবর্দ্ধমান আত্মপ্রকাশ তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অধিক হইতে অধিকতর সুসমঞ্জস পরিণতি—ইহাই হইল মানবজীবনের সমগ্র তাৎপর্য্য, সমস্ত সারাংশ। ভাবনা

আমাদের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি ; আমাদের যোগের সমগ্র অর্থ হইল এক দিব্য চেতনাতে পরিণতিলাভ করা—শুধু অন্তরাত্মায় নয়, তৎসঙ্গে আমাদের প্রকৃতির সকল অঙ্গের ভগবত্তায় আমূল রূপান্তরিত হওয়া।

যোগে আমাদের উদ্দেশ্য সীমিত ও বহির্মুখী অহমিকার নির্ব্বাসন এবং তাহার স্থানে আমাদের প্রকৃতির অন্তর্যামী প্রভুরূপে ভগবানের অভিষেক। ইহার অর্থ প্রথমতঃ বাসনাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া এবং কামনার পরিতৃপ্তিকে মানুষের কর্ম্ম ও গতির পরিচালক বলিয়া আর গ্রহণ না করা। তখন আধ্যাত্মিক জীবন নিজের পুষ্টিসংগ্রহ করিবে স্বরূপ সত্তার শুদ্ধ নিঃস্বার্থ আধ্যাত্মিক আনন্দ হইতে, কামনা বাসনা হইতে নহে। যাহাতে বাসনার ছাপ দেওয়া আছে সেই প্রাণপ্রকৃতিকে শুধু নয়, কিন্তু তৎসঙ্গে মনোময় সত্তাকেও এক নূতন জন্ম পরিগ্রহ এবং দিব্য এক রূপান্তর গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের বিবিক্ত অহংগত সীমিত ও অবিদ্যাচ্ছন্ন ভাবনা ও বুদ্ধিকে তিরোহিত হইতেই হইবে ; তাহার স্থানে আনয়ন করিতে হইবে ছায়াহীন দিব্যজ্যোতির উদার ও নির্দ্দোষ খেলার এক প্রবাহ, যাহার চরম পরিণতিতে এমন এক স্বাভাবিক স্বয়ম্ভূ ঋত-চিতের আবির্ভাব হইবে যাহার মধ্যে অর্দ্ধসত্যের অন্ধ অন্বেষণ অথবা স্খলনশীল বিভ্রান্তি নাই। যাহা বিশৃঙ্খল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, অহংকেন্দ্রিক ও ক্ষুদ্র অভিপ্রায়ে নিবদ্ধ আমাদের সেই সংকল্প ও ক্রিয়াকে রহিত করিয়া তাহার স্থানে বসাইতে হইবে ভগবদ প্রেরিত দিব্যভাবে পরিচালিত শক্তির এক পূর্ণক্রিয়া-ধারা, যাহা বেগবান ও বলবান, প্রোজ্জ্বল ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত। আমাদের সকল কর্ম্মের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক দ্বিধাহীন দৃঢ় এক সুউচ্চ সংকল্প রোপিত করিয়া তাহাকে সঞ্জীবিত ও ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিতে হইবে, যে সংকল্প স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও অবিক্ষুব্ধভাবে দিব্য ইচ্ছার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা থাকিবে। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহংগত ভাব-আবেগের অতৃপ্তিকর বাহ্য সকল খেলাকে উচ্ছেদ করিতে হইবে এবং তৎস্থানে তাহাদের পশ্চাতে আমাদের মধ্যে শুভ-মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষমান যে নিগূঢ় গভীর ও সুবিশাল চৈত্যহৃদয় আছে তাহাকে প্রকট করিতে হইবে ; ভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানভূমি এই আন্তর হৃদয় দ্বারা প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত হইয়া আমাদের সকল অনুভূতি, দিব্যপ্রেম ও বিচিত্র পরমানন্দের দুই যুগম ভাবাবেগের প্রশান্ত ও গভীর গতিধারাতে রূপান্তরিত করিতে হইবে। ইহাই হইল দিব্য মানব বা অতিমানব জাতির সংজ্ঞা। আমাদের যোগের দ্বারা এইপ্রকার অতিমানবকে আমরা অভিব্যক্ত

সাধন করিতে হইবে। এই বৃহত্তর সংকল্প ও শক্তিকে আমাদের অন্তরে সচেতন করিতে এবং তাহাকেই প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এখনকার মত শুধু পরিপোষণকারী অনুমন্তারূপী অতিচেতন শক্তিরূপে তাহাকে থাকিতে দিলে চলিবে না। যে সর্ব্বজ্ঞ শক্তি ও সর্ব্বসমর্থ জ্ঞান বর্ত্তমানে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার প্রজ্ঞানঘন লক্ষ্য ও ক্রিয়াধারাকে আমাদের মধ্যে অবিকৃতভাবে প্রবাহিত করাইয়া দেওয়ার সামর্থ্য অর্জন করিতে হইবে যাহার ফলে আমাদের রূপান্তরিত সমগ্র প্রকৃতি সেই শক্তি ও জ্ঞানের শুদ্ধ অব্যাহত সুসম্মত ও সহযোগী প্রণালীতে পরিণত হইবে। এই পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন ও সমর্পণ এবং তাহার পরিণাম স্বরূপ এই পূর্ণ রূপান্তর এবং স্বচ্ছন্দ সংক্রমণ হইল পূর্ণাঙ্গ কর্ম্মযোগের সমগ্র মৌলিক সাধনা ও চরম লক্ষ্য।

যে সব সাধকের মধ্যে উৎসর্গ ও সমর্পণ প্রথম স্বাভাবিক গতি ও ক্রিয়া-রূপে দেখা দেয় এবং তাহার ফলে ভাবনাশীল মন ও তাহার জ্ঞানের পরিপূর্ণ রূপান্তর সাধিত হয় অথবা সমগ্র আত্মোৎসর্গ ও আত্মসমর্পণের স্বাভাবিক পরিণাম-বশে যাহাদের হৃদয় ও তাহার সকল ভাবাবেগের রূপান্তর আসিয়া যায়, তাহাদের পক্ষেও সে পরিবর্ত্তনের মধ্যে কর্ম্মের উৎসর্গ অতিপ্রয়োজনীয় এক উপাদান। নহিলে, যদিও তাহারা পারলৌকিক অন্য জীবনে ভগবানকে পাইতেও পারে, কিন্তু এ জীবনে তাঁহাকে সার্থক করিতে পারিবে না ; তাহাদের পক্ষে জীবন এক অর্থশূন্য অদিব্য অসম্বদ্ধ তুচ্ছ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। যাহা আমাদের পার্থিব জীবনের জটিল সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ সেই প্রকৃত বিজয়শ্রী তাহারা কখন লাভ করিতে পারিবে না, তাহাদের প্রেম আত্মবিজয়ী পরম প্রেমে পরিণত হইবে না, তাহাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ বিরাট চেতনা ও সর্ব্বাবগাহী জ্ঞান হইয়া উঠিবে না। শুধু জ্ঞান বা শুধু ভগবদভিমুখী হৃদয়াবেগ অথবা এ উভয়কে একত্র যোগে লইয়া সাধনা আরম্ভ করা এবং কর্ম্মকে যোগের শেষের দিকের জন্য রাখিয়া দেওয়া অবশ্য চলিতে পারে। কিন্তু তাহাতে অসুবিধা এই যে সে ক্ষেত্রে সাধক নিজের মধ্যে একান্তভাবে বাস করিতে, অন্তর্ম্মুখী সূক্ষ্ম অনুভূতিতে ডুবিয়া থাকিতে, অন্তরের অঙ্গসকলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে ; নিজের আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতার এরূপ কঠিন আবরণে আবৃত হইয়া পড়িতে পারে যে ভবিষ্যতে সে আর বিজয়ীরূপে নিজেকে বাহিরের কাজে চালিয়া দিতে এবং নিজের ঊর্দ্ধতর প্রকৃতিতে যে সম্পদ অর্জিত হইয়াছে তাহা বহির্জীবনে কাজে লাগাইতে পারিবে না। অন্তরের বিজিত রাজ্যের সঙ্গে যখন আমরা বাহিরের কোন প্রদেশ যোগ করিতে চাহিব তখন দেখিতে পাইব যে বিশুদ্ধ অন্তর্ম্মুখী ক্রিয়াধারাতে আমরা অত্যধিক পরিমাণে

করে এবং তাহার মধ্যস্থিত ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্ম্ম যথাযথভাবে সম্পন্ন করে। প্রকৃতি নিজে ভোক্তা নয় ভোগ্য, নিজের মধ্যে সমস্ত ভোগসম্ভার বহন করে। নিসর্গরূপিণী এই প্রকৃতি জড়ভাবে সক্রিয় এক শক্তি,—কেননা ইহার উপর আরোপিত গতিবৃত্তিই সে পরিস্ফুট করিয়া তোলে, কিন্তু ইহার মধ্যে এক অদ্বয়বস্তু আছেন যিনি সব কিছু জানেন—এক পরমসত্তা সেখানে আসীন রহিয়াছেন যিনি তাহার সকল গতি ও সকল ক্রিয়াধারার কথা অবগত আছেন। এই প্রকৃতি তাহার সহিত যুক্ত বা তাহার অন্তরে অধিষ্ঠিত সত্তা বা পুরুষের জ্ঞান প্রভুত্ব ও আনন্দের আধার হইয়াই কাজ করে, কিন্তু যাহা তাহার অন্তর পূর্ণ করিয়া আছে সেই পুরুষের অধীন হইয়া তাহাকে প্রতিফলিত করিয়াই প্রকৃতি সে জ্ঞান ও প্রভুত্ব ও আনন্দের অংশভাগী হইতে পারে। পুরুষ জ্ঞাতা অথচ তিনি অচল ও নিষ্ক্রিয় ; তিনি তাঁহার আত্মসংবিৎ ও আত্মজ্ঞানে প্রকৃতির ক্রিয়ার আধার ও ভোক্তা। তিনি প্রকৃতির ক্রিয়ার অনুমন্তা আর প্রকৃতি তাঁহার অনুজ্ঞা অনুসারে তাঁহার পরিতুষ্টিব জন্যই ক্রিয়া করে। পুরুষ নিজে কার্য্য করেন না, তিনি প্রকৃতিকে তাহার ক্রিয়াশীলতার মধ্যে ধারণ করেন, তিনি আত্মজ্ঞানে যাহা দর্শন করেন প্রকৃতিকে কর্ম্মের শক্তি পদ্ধতি ও পরিণামে তাহা অভিব্যক্ত করিতে সক্ষম করেন। সাংখ্য দর্শন প্রকৃতি পুরুষের এই ভেদ নির্ণয় করিয়াছে, এবং যদিও তাহা সমগ্ররূপে খাঁটি সত্য নহে, কোন প্রকারে প্রকৃতি বা পুরুষ কাহারই উচচতম সত্যও নহে, তথাপি সত্তার অপরার্দ্ধে ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহা প্রামাণ্য ও অপরিহার্য্য বলিয়া স্বীকৃত।

ব্যষ্টি আত্মা বা দেহগত সচেতন সত্তা, হয় এই অনুভূতিশীল পুরুষের সঙ্গে না হয় সক্রিয় এই প্রকৃতির সঙ্গে একত্ব বা তাদাত্ম্যবোধে বাস করিতে পারে। যদি প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্যবোধে সে বাস করে তাহা হইলে তখন ব্যক্তিসত্তা প্রভু ভোক্তা বা জ্ঞাতা নয়, সে প্রকৃতির গুণ ও কর্ম্মসকলকে প্রতিবিম্বিত করে ; এই তাদাত্ম্যের ফলে সে প্রকৃতির স্বভাবসুলভ পরাধীনতা ও যান্ত্রিক কর্ম্মধারার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ; এমন কি প্রকৃতির মধ্যে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইয়া, মৃন্ময় ও ধাতব রূপের মধ্যে সুপ্ত অথবা উদ্ভিদ জীবনের মধ্যে প্রায় সুপ্ত হইয়া সে নিশ্চেতন বা অবচেতন হইয়া পড়িতে পারে। সেখানে সেই নিশ্চেতনার মধ্যে সে, অন্ধকার ও জড়তার যাহা তত্ত্ব শক্তি ও গুণ সেই তমের শাসনাধীন হইয়া পড়ে ; সত্ত্ব এবং রজও তথায় আছে, তবে তাহারা তমের স্থূল আবরণের নীচে প্রচ্ছন্ন। যখন দেহগত সত্তা তথা হইতে তাহার নিজস্ব স্বাভাবিক চেতনার মধ্যে প্রথমে উন্মিষিত বা উৎক্রান্ত হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার প্রকৃতিতে তখনও তমসের প্রাধান্যের জন্য যথার্থভাবে আত্মসংবিৎ লাভ করে নাই তখন সে ক্রমশঃ অধিক

এখানে প্রথমতঃ কর্ম্ম নির্ব্বাচন করা আমাদের উপরিস্থিত জীবন্ত সর্ব্বোচ্চ সত্যের আদেশ অনুসারে আপন ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও মান অনুসারে নয়। তাহার পর আধ্যাত্মিক চেতনাতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্র আমাদের নিজের পৃথক সংকল্প ও গতিবৃত্তি অনুসারে কর্ম্ম আর না করা, কিন্তু যাহা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আছে সেই দিব্যসংকল্পের প্রেরণা ও পরিচালনার অধীনে কর্ম্মকে ক্রমশ অধিক পরিমাণে ঘটিতে ও উপচিত হইতে দেওয়া। অবশেষে চূড়ান্ত পরিণতিতে, দিব্য শক্তির সহিত অভিন্ন একত্বে বা তাদাত্ম্যে উন্নীত হওয়া—জ্ঞানে, কর্ম্মে, শক্তিতে, চেতনাতে ও জীবনের আনন্দে ; এমন এক বীর্য্যবান গতিধারা অনুভব করা যাহা মর্ত্ত্য কামনা-বাসনা, প্রাণশক্তির সহজ প্রবৃত্তি ও প্রবেগ এবং অলীক মনোময় স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত নয় কিন্তু যাহার জ্যোতির্ম্ময় উৎপত্তি ও পরিণতি অমর এক আত্মা-নন্দ এবং অনন্ত এক আত্মজ্ঞানের মধ্য হইতে। কেননা প্রাকৃত মানুষ যখন দিব্য আত্মা ও শাশ্বত চিৎপুরুষের অধীনতা সচেতনভাবে স্বীকার করে এবং নিজেকে তাহার মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দেয় তখনই এই কর্ম্ম আসে ; চিদাত্মা চিরদিন এই বিশ্বপ্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া আছেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিতেছেন।

কিন্তু কার্য্যতঃ সাধনার কোন্ কোন্ ধাপ অবলম্বন করিয়া আমরা এই চরমোৎকর্ষে পৌঁছিতে পারি ?

স্পষ্টতঃ সকল অহংগত কর্ম্ম ও তাহার ভিত্তিস্বরূপ অহংগত চেতনার বিলোপসাধন করাই আমাদের বাঞ্ছিত এই চরমোৎকর্ষে পৌঁছিবার চাবিকাঠি। কর্ম্মযোগের পন্থায় কর্ম্মের গ্রন্থিমোচনই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া যেখানে তাহার প্রধান বাঁধন রহিয়াছে সেইখানেই অর্থাৎ ক্রামনা ও অহমিকার মধ্যে আমাদিগকে তাহা করিতে চেষ্টা করিতে হইবে ; কেননা তাহা না করিলে আমরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই চারিটি সূত্রকে শুধু কাটিয়া দিতে থাকিব কিন্তু গ্রন্থির হৃদয় বা কেন্দ্র যেমন ছিল তেমনই রহিয়া যাইবে। আমরা যে এই অবিদ্যাচ্ছন্ন ও ভেদগত প্রকৃতির অধীনতাপাশে আবদ্ধ আছি তাহার গ্রন্থি দুইটি—কামনা ও অহংবোধ। আর এই দুইটির মধ্যে কামনার স্বাভাবিক বাসস্থান রহিয়াছে ভাবাবেগ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে এবং তথা হইতে তাহা আমাদের ভাবনা ও সংকল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে ; অহমিকাও প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত গতিবৃত্তির মধ্যে থাকে, কিন্তু সে তাহার শিকড়

গভীরে ভাবনাময় মন ও সংকল্পের মধ্যেও বিস্তার করে আর সেইখানেই সে পূর্ণরূপে আত্মসচেতন হয়। বিশ্বব্যাপী সর্ব্বগ্রাসী অজ্ঞানের এই যুগ্ম অন্ধকারময় শক্তিকে আলোকিত ও বিদূরিত করিতে হইবে।

কর্ম্মের ক্ষেত্রে বাসনা নানা রূপ গ্রহণ করে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান হইল প্রাণময় সত্তায় কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা বা আকূতি। আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ফল একটা অন্তরের সুখ লাভরূপ পুরস্কার হইতে পারে, হইতে পারে কোন ইঙ্গিত ভাবনা বা কোন পোষিত সংকল্পের সিদ্ধি, অহংগত কোন ভাবাবেগের পরিতৃপ্তি অথবা আমাদের উচচতম আশা এবং উচচাভিলাষের সার্থকতা জনিত গর্ব্ব। অথবা এই ফল হইতে পারে কোন বাহ্য পুরস্কার, কোন সম্পূর্ণ বাহ্যবস্তু—যথা ধন পদ সম্মান বিজয় সৌভাগ্য অথবা প্রাণগত বা দেহগত অন্য কোন কামনার তৃপ্তি। কিন্তু ইহারা সকলেই সমানভাবে প্রলোভন যাহা দ্বারা অহমিকা আমাদিগকে ধরিয়া রাখে। এই সমস্ত পরিতুষ্টি সর্ব্বদাই আমাদিগকে অলীক এক স্বাধীনতা ও প্রভুত্বের বোধ দিয়া ভুলাইয়া রাখে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে অন্ধ বাসনা জগৎকে চালাইতেছে তাহার কোন স্থূল বা সূক্ষ্ম, কোন মহান বা নিকৃষ্ট রূপই আমাদিগকে সংবদ্ধ সঞ্চালিত সমাচ্ছন্ন ও তাড়িত করিতেছে। তাই কর্ম্মসম্বন্ধে গীতার প্রথম অনুশাসন এই যে নিষ্কামভাবে বা কোন ফলকামনা না করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

আপাত দৃষ্টিতে এ-বিধানটি কত সহজ, কিন্তু একান্ত সরলভাবে এবং মুক্তি-জনক সমগ্রতার সহিত ইহা পালন করা কত কঠিন! আমাদের অধিকাংশ কর্ম্মে এ তত্ত্বের অনুসরণ আমরা বড় একটা করি না; যেটুকু করি তাহাও প্রায়ই আমাদের স্বাভাবিক কামনা বাসনার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করিবার এবং অত্যাচারী সেই আবেগের কর্ম্মের চরমমাত্রা কিছু পরিমাণে উপশমিত করিবার জন্যই করি। যতদূর সম্ভব ভালভাবে দেখিলেও, যদি আমরা আমাদের অহমিকাকে কথঞ্চিৎ সংযত বা সংশোধিত করিতে পারি যাহাতে তাহা আমাদের নীতিবোধকে খুব বেশী আঘাত না করে এবং অপরের পক্ষে অত্যধিক পীড়াদায়ক না হয় তাহা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হই। আমাদের এই আংশিক আত্মসংযমকে আমরা নানা নাম ও নানা রূপ দিয়া থাকি; পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিতে, কোন নৈতিক তত্ত্ব দৃঢ়ভাব অনুসরণ করিতে, তিতিক্ষু দার্শনিকের মত সহনশীল হইতে, ধর্ম্মের প্রেরণাতে সব কিছু নত মস্তকে গ্রহণ করিতে অথবা ধীরভাবে বা আনন্দ সহকারে ভগবদিচ্ছার বশ্যতা স্বীকার করিতে আমরা নিজদিগকে অভ্যস্ত করি। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় গীতার অভিপ্রেত নহে, যদিও স্বস্থানে তাহাদের প্রত্যেকের উপযোগিতা

নানা দিকে চালাইয়া লইয়া যায়। এই সমস্ত বাসনা কিম্বা অন্য কিছু আমাদের কর্ম্মের হেতু বা প্রবর্ত্তকরূপে বর্ত্তমান যদি না থাকে তবে মনে হইতে পারে যে কর্ম্মের সকল প্ররোচনা বা প্রযোজকশক্তি যেন অপসারিত হইয়াছে এবং কর্ম্ম অবশ্যই বন্ধ হইয়া যাইবে। গীতা এ সমস্যার উত্তররূপে দিব্যজীবনের তৃতীয় মহান রহস্য উপস্থিত করিয়াছে, বলিয়াছে যে সকল কর্ম্ম ক্রমবর্দ্ধমান-ভাবে ভগবদভিমুখী এবং পরিশেষে ভগবদধিকৃত চেতনা দিয়াই করিতে হইবে ; আমাদের সকল কর্ম্মকেই করিতে হইবে ভগবানে উৎসৃষ্ট যজ্ঞ, অবশেষে আমাদের সকল সত্তা, মন সংকল্প হৃদয় ইন্দ্রিয় প্রাণ ও দেহ সেই পরম একের চরণে সমর্পণ করিতে হইবে, আমাদের কর্ম্মের সমগ্র প্রেরণা আসিবে ভগবৎ-প্রেম ও ভগবৎ-সেবা হইতে। কর্ম্মের প্রযোজকশক্তি ও মূল প্রকৃতির এই রূপান্তর সাধনই গীতার মুখ্য তত্ত্ব ; ইহাই গীতার কর্ম্ম প্রেম ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয়ের ভিত্তি। সর্ব্বশেষে কামনা নয় চেতনাতে অনুভূত শাশ্বতের দিব্য-সংকল্পই থাকিবে আমাদের সকল কর্ম্মের একমাত্র চালকশক্তি ও সকল প্রারম্ভের একমাত্র উৎসরূপে।

সমত্ব, আমাদের কর্ম্মফলের সকল বাসনা ত্যাগ, আমাদের প্রকৃতির তথা সকল প্রকৃতির পরম প্রভুর নিকট উৎসৃষ্ট যজ্ঞস্বরূপে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান—গীতার কর্ম্মযোগপন্থার এই তিনের যুগপৎ আচরণ হইল ঈশ্বরাভিমুখে চলিবার প্রথম পদক্ষেপ।

ভার্য্যা প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় ভার্য্যা প্রিয়া ভবতি''—'পত্নীর জন্য আমাদের নিকট পত্নী প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই পত্নী প্রিয় হয়।' নিম্নতর অর্থে প্রাকৃত ব্যষ্টিসত্তার সম্বন্ধে ইহাই অহংগত রঙীন ও আবেগময় প্রেমের উচ্ছ্বাসোক্তির পশ্চাতে স্থিত কঠোর তথ্য, কিন্তু উচ্চতর অর্থে যাহা অহমিকা পরিশূন্য যাহা দিব্য সেই প্রেমেরও ইহাই গূঢ় মর্ম্ম। সকল প্রকৃত প্রেম সকল আত্মোৎসর্গ মূলতঃ মানুষের আদিম অহমিকা ও তাহার ভেদগত ভ্রান্তির বিরুদ্ধে প্রকৃতির প্রতিবাদ; অপরিহার্য্য প্রাথমিক খণ্ডজ্ঞান হইতে পুনরায় একত্বের মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য ইহা তাহার এক প্রচেষ্টা। জীবে জীবে মিলন বা ঐক্যবোধ মূলতঃ আত্মাকে আবিষ্কার করা, যাহা হইতে আমরা বিবিক্ত ও ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছি তাহার সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া এবং অপরের মধ্যে নিজের আত্মাকে খুঁজিয়া পাওয়া।

কিন্তু প্রেম ও একত্বের মানুষী রূপ যাহা অন্ধকারের মধ্যে সন্ধান করে একমাত্র দিব্য প্রেম ও দিব্য একত্ব তাহা আলোকের মধ্য দিয়াই লাভ করে। কেননা জীবনের সাধারণ প্রয়োজনে মিলিত আমাদের দেহস্থ কোষাণুগুলির (cells) মধ্যে যেরূপ এক সমবায় ও সাহচর্য্য দেখা যায়, প্রকৃত মিলন বা একত্ব সেরূপ এক সাহচর্য্য ও সমবায় শুধু নয়; এমন কি তাহা হৃদয়াবেগের মধ্য দিয়া একটা জানা, একটা সহানুভূতি এক সংহতি বা পরস্পরের এক সান্নিধ্যও নহে। প্রকৃতির বিভাগের দ্বারা যাহাদের নিকট হইতে আমরা পৃথক হইয়া পড়িয়াছি তাহাদের সহিত কেবল তখনই আমাদের প্রকৃত মিলন ও ঐক্য সাধিত হইবে, যখন আমরা বিভাগকে লোপ করিয়া দিতে পারিব এবং যাহাকে এখন অপর বোধ হইতেছে তাহার মধ্যে আপনাকে দেখিতে পাইব। সাহচর্য্যের অর্থ দেহগত ও প্রাণগত ঐক্য; পরস্পরকে সাহায্য করা, পরস্পরে দাবিদাওয়া মানিয়া লওয়াই এখানে আত্মোৎসর্গের অর্থ। সামীপ্য সমবেদনা ও সংহতি এক মনোময় নৈতিক ও আবেগময় ঐক্য গড়িয়া তুলিতে পারে, এখানে আত্মোৎসর্গের অর্থ পরস্পরের সহযোগিতা ও তুষ্টিসাধন। কিন্তু যথার্থ ঐক্য ও মিলন এক আধ্যাত্মিক বস্তু; যেখানে আত্মোৎসর্গ হইবে পরস্পরে পূর্ণ আত্মদান, আমাদের চিন্ময় ধাতুর পারস্পরিক সংযোগ। যজ্ঞবিধান এইভাবে প্রকৃতির মধ্যে অগ্রসর হইয়া এই পরিপূর্ণ ও নিঃশেষ আত্মদানে পর্য্যবসিত হয়; ইহা উৎসর্গকারী বা যজ্ঞের হোতা ও যাহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ বা যজ্ঞ করা হয় সেই যজ্ঞেশ্বর এই উভয়ের মধ্যে যে একই আত্মা আছে সেই চেতনা জাগাইয়া তোলে। মানুষের প্রেম ও ভক্তি যখন দিব্য হইয়া উঠিবার জন্য সাধনা করে, তখন যজ্ঞের এই চরম পরিণতিতেই তাহার পরাকাষ্ঠা লাভ

পরিণতিতে তাহারা সকলেই সেই পরম একের দ্বারাই শাসিত হয়। সব কিছুই তাঁহার অগণিতরূপের নিকট উৎসর্গ করা হইতেছে এবং সকল অর্ঘ্যই সেই রূপরাজির মধ্য দিয়া একই অখণ্ড সর্ব্বব্যাপীর চরণে পৌঁছিতেছে। যে কোন রূপে ও যে ভাব লইয়া আমরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হই সেই রূপে ও সেই ভাবে তিনি আমাদের উৎসর্গ গ্রহণ করেন।

কর্ম্মযজ্ঞের ফল ও কর্ম্মের স্বরূপ তাহার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের পশ্চাতে স্থিত ভাব অনুসারে নানারূপে দেখা দেয়। কিন্তু অপর সকল যজ্ঞই আংশিক, অহংগত, বিমিশ্র, ক্ষণিক, অপূর্ণ—এমনকি উচ্চতম শক্তি ও তত্ত্বরাজির নিকট যে উৎসর্গ তাহাদের প্রকৃতিও এইরূপ ; আবার তাহাদের ফলও তেমনি আংশিক, সীমিত ও পার্থিব ; প্রতিক্রিয়ায় বিমিশ্র, অপ্রধান ও গৌণ বা সাধনপথের মধ্যবর্ত্তী উদ্দেশ্যসাধনে শুধু সক্ষম। যজ্ঞদেবতার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় একমাত্র উৎসর্গ হইল এক চরম পরম ও পরিপূর্ণ আত্মদান ; ইহা সামনাসামনি দাঁড়াইয়া জ্ঞান ও ভক্তি সহকারে স্বাধীনভাবে এক নিঃশেষ সমর্পণ সেই এক অদ্বয় বস্তুর চরণে—যিনি যুগপৎ আমাদের অন্তর্নিহিত আত্মা, পরিবেশ ও উপাদান রূপে সর্ব্বময় ব্রহ্ম, এই বা যে কোন অভিব্যক্তির অতীত পরম সত্য, আবার যিনি নিগূঢ়ভাবে যুগপৎ এই সব কিছু, সর্ব্বত্র প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, সর্ব্বগত অথচ সর্ব্বাতীত। কারণ যে জীবাত্মা পরিপূর্ণরূপে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করে, ভগবানও তাহার কাছে পূর্ণরূপে নিজেকে দান করেন। যে তাহার সমগ্র প্রকৃতিকে উৎসর্গ করে শুধু সে-ই পরমাত্মাকে পায় ; যে সব কিছু দান করে শুধু সেই সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী ভগবানকে ভোগ করে। পরম এক আত্মসমর্পণ দ্বারাই শুধু পরাৎপরকে পাওয়া যায়। আমরা যাহা কিছু তাহার সবই উৎসর্গের ফলে যে ঊর্দ্ধায়ন হয় কেবল তাহারই বলে আমরা সর্ব্বোত্তমকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারি এবং এখানে এই পৃথিবীতে সর্ব্বাতীত চিদ্বস্তুর সর্ব্বানুস্যূত চেতনার মধ্যে বাস করিতে পারি।

মোট কথা, আমাদের নিকট দাবী এই যে আমাদের সমগ্র জীবনকে এক সচেতন যজ্ঞে পরিণত করিতে হইবে। আমাদের সত্তার প্রতিমুহূর্ত্তকে প্রতি গতিবৃত্তিকে শাশ্বত ব্রহ্মের নিকট ভক্তিপূর্ণ আত্মদানের এক নিরবচ্ছিন্ন ধারা করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের সকল কর্ম্ম, যেমন আমাদের বৃহত্তম অতি

মধ্যে, সব কিছুই ভগবান, তিনি ছাড়া জগতে আর কিছু নাই—এই ভাবনা বা এই বিশ্বাসই হইবে কর্ম্মীর চেতনার সমগ্র পটভূমিকা, অবশেষে ইহাই তাহার চেতনার সমগ্র উপাদান হইয়া দাঁড়াইবে। এইভাবের এক নিত্যস্মরণ স্বয়ং সক্রিয় এক ধ্যান যাহাকে আমরা এত প্রবলভাবে স্মরণ করি অথবা যাহাকে এরূপ নিয়ত ধ্যান করি, পরিশেষে অবশ্যম্ভাবীরূপে তাঁহারই এক গভীর ও নিরবচ্ছিন্ন দর্শন হইয়া দাঁড়াইবে, তাঁহারই এক প্রত্যক্ষ ও সর্ব্বালিঙ্গনকারী চেতনায় পরিণত হইবে। কেননা ইহা প্রতিমুহূর্ত্তে যিনি সর্ব্বসত্তা, সর্ব্বসংকল্প ও সর্ব্বকর্ম্মের উৎস সাধককে তাহার পরিচিন্তনে নিয়ত বাধ্য করে ফলে যিনি তাহাদের কারণ, ধর্ত্তা, ও ভর্ত্তা, তাঁহারই মধ্যে সকল বিশিষ্টরূপ সকল মূর্ত্তির সঙ্গে সাধক যুগপৎ মিলিত হইতে এবং তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। এই-ভাবে অগ্রসর হইতে গিয়া পথের শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সাধক সর্ব্বত্র বিশ্বব্যাপী বিরাট পুরুষের কর্ম্মাবলি জীবন্ত ও চলন্তভাবে দেখিতে পাইবে আর সে দেখা স্থূল দৃষ্টিতে দেখা অপেক্ষা কোনপ্রকার ন্যূনতরভাবে বাস্তব বলিয়া মনে হইবে না। পথের শীর্ষস্থানে উন্নীত হইলে সে অতিমানসভূমিতে বিশ্বাতীত পরাৎপরের সান্নিধ্যে পৌঁছিবে এবং তথায় সর্ব্বদা বাস ভাবনা সংকল্প ও কর্ম্ম করিবে। যাহা কিছু আমরা দেখি শুনি যাহা কিছু আমরা স্পর্শ ও ইন্দ্রিয়দ্বারা বোধ করি, যাহা কিছুর সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই তাহাদের সব কিছুকেই সেই পূজার ও সেবার বস্তু বলিয়া জানিতে এবং বুঝিতে হইবে ; সব কিছুকে পরিণত করিতে হইবে ভগবানের মূর্ত্তিতে, সব কিছুকেই জানিতে হইবে পরম দেবতার মন্দিররূপে, সব কিছুকে দেখিতে হইবে শাশ্বত সর্ব্বব্যাপী পরমসত্তার দ্বারা সমাবৃত বলিয়া। যদি ইতিপূর্ব্বেই না ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে পরিশেষে কর্ম্মযোগের এই পন্থা দিব্যসত্তা, দিব্যসংকল্প ও দিব্যশক্তির সহিত ঘনিষ্ঠযোগ স্থাপনের ফলে জ্ঞানমার্গে পরিণত হইবে, সেখানে জ্ঞান হইবে এমন পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গীণ যাহা জীবের বুদ্ধি নিজে কখনও গড়িয়া তুলিতে বা যুক্তিবিচার অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় না।

পরিশেষে এই আত্মসমর্পণ যোগের সাধনা আমাদের অন্তরে অহমিকার যে সমস্ত আশ্রয় আছে তাহাদিগকে বর্জন করিতে, আমাদের মন, সংকল্প ও ক্রিয়ার মধ্য হইতে তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে, অহংকারের বীজ, তাহার অস্তিত্ব এবং আমাদের প্রকৃতির উপর তাহার সকল প্রভাব পূর্ণরূপে অপসারিত করিতে আমাদিগকে বাধ্য করে। ভগবানেরই জন্য সকল কার্য্য করিতে হইবে, সকল গতিবৃত্তিকে তাঁহারই দিকে ফিরাইতে হইবে। বিবিক্ত সত্তা রূপে আমাদের নিজেদের জন্য কিছু করা চলিবেনা ; তেমনি প্রতিবেশী

সর্ব্বব্যাপী সত্তা আমার যান্ত্রিক সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে এবং তাহাকে অধিকার করিতে আরম্ভ করে এবং মনে হয় যেন তাহারই মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে আমার কর্ম্মের সকল প্রেরণা, আমার ভাবনা ও বাক্যের সকল আলোক, আমার চেতনার সকল রূপায়ণ, এবং এই অদ্বয় বিশ্বব্যাপী সত্তার অন্য আত্মরূপ সকলের সহিত রহিয়াছে আমার চেতনার সকল সম্বন্ধ ও সংযোগ। এখন আর আমি এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তা নহি, আমি তিনি, এই অর্থে যে আমার প্রকৃত সত্তা তাঁহার স্বরূপ সত্তারই এক প্রকৃত অংশ যাহা এই জগদ্‌ব্যাপারে এক বিশিষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট রূপের ভর্ত্তা ও বিধায়ক।

যাহা সকল উপলব্ধির চরম তেমন এক মৌলিক উপলব্ধিও কখন কখন প্রথমেই যথার্থ উন্মীলন অথবা যোগের প্রাথমিক পর্য্যায় রূপে দেখা দিতে পারে। ইহা এক ঊর্দ্ধস্থিত অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বাতীত অজ্ঞেয় সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, যাহা আমার এবং যে জগতে আমি বিচরণ করি বলিয়া বোধ করি সেই জগতের ঊর্দ্ধে অবস্থিত, যাহা দেশ ও কালের অতীত এক অবস্থা বা সত্তা, যাহাকে আমার মধ্যস্থ কোন মৌলিক চেতনা শুধু যে নিঃসন্দিগ্ধভাবে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে তাহা নয়, তাহার দিকে কোন এক অলক্ষ্য কারণে অনিবার্য্যরূপে আকৃষ্ট ও তাহার অনন্য তাত্ত্বিক বাস্তবতা দ্বারা অভিভূত হয়। এই অনুভূতির সহিত সাধারণতঃ সমান অনিবার্য্যরূপে এই বোধ জাগিয়া উঠে যে, এখানকার সব কিছুই স্বপ্ন বা ছায়ার মত মিথ্যা অথবা তাহাদের স্বভাবে তাহারা সাময়িক, অর্দ্ধ সত্য মাত্র। কোনটাই কোন মূল বস্তু নহে। অন্ততঃ কিছুকালের জন্য মনে হইবে আমার চতুর্দ্দিকে যেন এক চলচ্চিত্রের নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ছায়ারূপ বা বাহ্য আকার মাত্র দেখা যাইতেছে, এবং আমার নিজের ক্রিয়াকে বোধ হইবে যেন আমাদের ঊর্দ্ধস্থ বা বহিঃস্থ এখনও অজ্ঞাত এবং হয়ত অজ্ঞেয় কোন উৎস হইতে নিঃসৃত এক তরল রূপায়ণ। যদি এই চেতনাতে থাকিয়া যাই, যদি এই প্রারম্ভিক সূত্র ধরিয়াই চলি অথবা বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে এই প্রথম নির্দ্দেশ যদি মানিয়া লই, তাহা হইলে আমরা অজ্ঞেয় তত্ত্বের মধ্যে আত্মা ও বিশ্বের বিলয়ের অর্থাৎ মোক্ষ ও নির্ব্বাণের দিকে অগ্রসর হইব। কিন্তু ইহাই পরিণামের একমাত্র ধারা নহে; তাই বরং কালাতীত এই শূন্যগর্ভ মুক্তির নীরবতার মধ্যে ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব যতদিন না তাহার মধ্য দিয়া আমার সত্তা ও কর্ম্মের সেই আজিও অজানা উৎসের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে আরম্ভ না হইতেছে; তখন দেখিব যে শূন্য পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, এবং ইহার মধ্য হইতে নির্গত হইতেছে অথবা ইহাতে সবেগে প্রবিষ্ট হইতেছে ভগবানের বহুভঙ্গিম সমগ্র

মধ্যস্থ কোন এক আধ্যাত্মিক বোধের নিকট তিনি যে কোন রূপ বা ঘটনার অপেক্ষাও অনেক বেশী বাস্তব, তিনি বিশ্বব্যাপী তথাপি তাঁহার সত্তা বিশ্বের কোন বস্তুর বা বিশ্বের অখণ্ড সমগ্রতার উপর নির্ভর করে না ; জগতের সব কিছু যদি অন্তর্হিত হইয়া যায় তাহা হইলে সে অবলুপ্তিতে সাধকের নিকট এই শাশ্বতের অন্তরঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন অনুভূতির কোন ইতরবিশেষ হয় না। সে এক অনির্ব্বচনীয় স্বয়ম্ভূ সত্তার বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছে যিনি তাঁহার নিজের ও সর্ব্ববস্তুর স্বরূপ সত্য ; সে এক মূল পরম চেতনাকে অন্তরঙ্গভাবে জানিয়াছে আমাদের ভাবনাশীল মন প্রাণ-বোধ (life-sense) এবং দেহ-বোধ (body-sense) যাহার আংশিক ও খর্ব্বরূপ, এই চেতনার সহিত আছে এমন এক অসীম শক্তি, যাহা হইতে হইয়াছে সকল শক্তির উদ্ভব, তথাপি এই সমস্ত শক্তির একত্রীভূত সমষ্টি বা বীর্য্য বা প্রকতি দ্বারা সে পরম শক্তির কোন ব্যাখ্যা পাওয়া, কোন বিবরণ দেওয়া যায় না ; সাধক অনুভব করে যে সে এক অবিচ্ছেদ্য স্বয়ম্ভূ পরম আনন্দের মধ্যে বাস করিতেছে যে আনন্দ নিম্নতর এই পার্থিব ক্ষণিক আমোদ-আহ্লাদ-হর্ষ-সুখ নহে। এই স্থির অবিকম্প অনুভূতির চারিটি লক্ষণ—অবিকারী অবিনাশী আনন্ত্য কালাতীত এক নিত্যতা, এমন এক আত্ম-সচেতনতা যাহা গ্রহণশীল, প্রতিক্রিয়াশীল অথবা ইতস্ততঃ অন্ধ অন্বেষণকারী মানস চেতনা নয়, কিন্তু মানস চেতনার পশ্চাতে উপরে ও নীচে এমনকি যাহাকে আমরা নিশ্চেতনা বলি তাহারও মধ্যে অবস্থিত এবং যাহার মধ্যে অন্য কোন সত্তার থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই তেমন এক একত্ব। তথাপি সাধক ইহাও দেখিতে পায় যে এই স্বয়ম্ভূ সৎই এক চিন্ময় কালপুরুষ (Time-spirit) সকল ঘটনার প্রবাহ নিজের মধ্যেই বহন করিতেছেন, এক আত্মপ্রসারিত অধ্যাত্মদেশ (Spiritual space) রূপে সর্ব্ববস্তু ও সর্ব্বসত্তা নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এক অধ্যাত্ম ধাতু (Spirit-substance) রূপে, যাহা অনাধ্যাত্মিক ক্ষণিক ও সীমিত বলিয়া বোধ হয়, একমাত্র তিনিই তাহাদের সকলের সকলরূপ ও উপাদান হইয়াছেন। কেননা তিনি জগতে যাহা কিছু ক্ষণবিধ্বংসী সসীম, দেশ ও কালগত সে সকলকেও তাহাদের মূল-ধাতু শক্তি ও বীর্য্যে সেই অদ্বয়, শাশ্বত ও অনন্ত হইতে অভিন্ন বলিয়া দেখেন।

তথাপি শাশ্বত আত্মসচেতন এই সৎ চিন্ময়, এই চৈতন্য স্বয়ংজ্যোতি, মহাশক্তির এই আনন্ত্য, কালাতীত ও অন্তহীন এই পরম আনন্দ, সাধকের অন্তরে বা তাহার সম্মুখে শুধু যে রহিয়াছে তাহা নহে। ইহা ছাড়াও তাহার অনুভূতিতে সর্ব্বদা রহিয়াছে পরিমেয় দেশ ও কালের মধ্যে অবস্থিত এই বিশ্ব, হয়ত বা এক প্রকার সীমাহীন সান্ত, যাহার মধ্যে রহিয়াছে যত সব অচিরস্থায়ী,

করিতেছে। ব্যতিরেকী অথবা অন্যনিরপেক্ষভাবে শুধু এই সাক্ষীচেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সাধক নীরব, নির্বিকার ও নিশ্চল হইয়া যায়; সে দেখিতে পায় এতদিন সে নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রকৃতির গতিবৃত্তি সকলকে প্রতিফলিত ও নিজস্ব করিয়া লইয়াছে, আর এই প্রতিফলনের গতিবৃত্তিগুলি তাহার অন্তরঙ্গ সাক্ষীরূপী আত্মার নিকট হইতেই তাহাদের প্রতীয়মান আধ্যাত্মিক মূল্য ও অর্থলাভ করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সে আরোপ বা তাদাত্ম্যজাত প্রতিফলন হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়াছে; সে এখন তাহার চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু গতিশীল তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন এবং তাহার নীবব আত্মার চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সকল ক্রিয়া তাহার বাহিরে পড়িয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহাদের নিবিড় প্রাক্তন সত্য; এখন মনে হইতেছে তাহারা যান্ত্রিক এবং তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওযা বা শেষ করিয়া ফেলা যায়। ব্যতিরেকী ভাবে শুধু সক্রিয় গতিবৃত্তির মধ্যে প্রবেশ করিলে সাধকের মধ্যে এক বিপরীত আত্মবোধ দেখা দেয়; তখন তাহার নিজের অনুভূতিতেই মনে হয় যে সে নিজে ক্রিয়ারাজির এক সমষ্টি, শক্তিসকলের এক রূপায়ণ এক পরিণাম; এই সকলের মধ্যে তাহার কোন সক্রিয় চেতনা এমনকি এক প্রকার এক সক্রিয় সত্তা যদি থাকে তথাপি তাহার মধ্যে কোথাও আর স্বতন্ত্র আত্মা নাই। সত্তার এই দুই বিভিন্ন ও বিরোধী অবস্থা তাহার মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া দেখা দেয় অথবা একই সঙ্গে আসিয়া পরস্পরের সম্মুখে দাঁড়ায়; আন্তর সত্তায় অধিষ্ঠিত এক নীরব ভাব বা অবস্থা শুধু পর্য্যবেক্ষণ কবে কিন্তু থাকে নিশ্চল ও অসম্পৃক্ত; অন্য ভাব বাহিরে বা বহিশ্চর সত্তাতে সক্রিয়ভাবে অবস্থিত থাকিয়া তাহাব অভ্যাসগত গতিবৃত্তি অনুসরণ করিয়া চলে। এসময় সাধক অন্তরাত্মা ও প্রকৃতি অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির বিরাট দ্বৈতভাবের সুতীব্র কিন্তু বিবিক্ত উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

কিন্তু যেমন তাহার চেতনা গভীর হইতে থাকে তেমনি সে বুঝিতে থাকে যে ইহা শুধু একটা প্রাথমিক বহিরঙ্গ সত্যাভাস মাত্র। কারণ সে দেখিতে পায় যে তাহার মধ্যস্থ নীরব ভর্ত্তারূপী সাক্ষীপুরুষের অনুমোদন ও অনুমতির বলেই এই কার্য্যকরী প্রকৃতি তাহার সত্তার উপর অন্তরঙ্গ বা অবিরামরূপে কার্য্য করিতে পারে; যদি অন্তরাত্মা তাহার অনুমোদন প্রত্যাহার করিয়া নেয় তাহা হইলে তাহার উপর ও তাহার মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়াবলি পূর্ণরূপে যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ তাহারা প্রবল থাকে যেন তখনও তাহাদের প্রভাব বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পরে ক্রমশঃ তাহাদের সক্রিয়তা ও বাস্তবতা হ্রাস পাইতে থাকে। প্রকৃতির কার্য্যের এই অনুমোদন বা অস্বীকৃতির শক্তি

ভাবে সম্বদ্ধ অজ্ঞানের যে যুক্ত রাজত্ব চলিতেছে তাহা অতিক্রম করিতে এবং তাহার সীমা পার হইয়া তথায় পৌঁছিতে সমর্থ হইবে যেখানে অতিমানস বিজ্ঞানের মধ্যে আধ্যাত্মিক মনের বিলয় ঘটে। অদ্বয় তত্ত্বের এই তৃতীয় এবং সক্রিয়তম দ্বৈত ভাবের মধ্য দিয়াই সাধক যজ্ঞেশ্বরের সত্তার গভীরতম রহস্যের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতার সহিত প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে।

কারণ নিশ্চেতনা হইতে চেতনার অভিব্যক্তি, প্রাণহীন বস্তুর মধ্য হইতে প্রাণের উদ্ভব, অচেতন জড়ের মধ্য হইতে আত্মার প্রকাশের মত আমাদের জীবন সমস্যার সমাধান দৃশ্যমান নৈর্ব্ব্যক্তিক বিশ্বের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠান রহস্যের পশ্চাতে লুকানো রহিয়াছে। এখানে আবার আর এক সক্রিয় দ্বৈতের সাক্ষাৎ পাই, যাহা প্রথম দৃষ্টিতে যতটা মনে হয় তদপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক এবং ধীরে ধীরে প্রকাশমানা পরমা শক্তির খেলার জন্য গভীরভাবে প্রয়োজন। এই দ্বৈতের এক মেরুতে দাঁড়াইয়া নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্যে তাহার মনকে অনুসরণ করিয়া সাধকের পক্ষে সর্ব্বত্র এক মৌলিক নৈর্ব্ব্যক্তিকতা দেখা সম্ভব। জড়জগতে পরিণামশীল অন্তরাত্মা এক বিরাট নৈর্ব্ব্যক্তিক নিশ্চেতনা হইতে যাত্রা আরম্ভ করে, কিন্তু তাহার মধ্যেই আমাদের আন্তর দৃষ্টি আবরণের পশ্চাতে এক অনন্ত চিদ্‌বস্তুকে দেখিতে পায়; তাহার প্রগতির পথে এক অনিশ্চিত চেতনা ও ব্যক্তিত্ব উন্মিষিত হইয়া উঠে যাহাদের জাগরণ যখন সম্পূর্ণ হয় তখনও তাহাকে একটা অবান্তর ঘটনা মাত্র মনে হয়, যদিও নিরবচ্ছিন্ন এক পর্য্যায়ক্রমে সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলে; প্রাণের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা সকলের মধ্য দিয়া এই অন্তরাত্মা মনের মধ্য হইতে এক অনন্ত নৈর্ব্ব্যক্তিক পরম অতিচেতনার মধ্যে উন্নীত হয় যেখানে ব্যক্তিত্ব, মন-শ্চেতনা, প্রাণচেতনা সব কিছু যেন মনে হয় এক মুক্তিপ্রদ বিলয় বা নির্ব্বাণের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহার চেয়ে একটু নিম্নতর ভাবেও সাধক অনুভব করে যে এই মৌলিক নৈর্ব্ব্যক্তিকতা সর্ব্বত্রই এক প্রবল মুক্তিপ্রদ শক্তি। সে দেখিতে পায় যে এই নৈর্ব্ব্যক্তিকতা তাহার জ্ঞানকে ব্যক্তিগত মনের সংকীর্ণতা হইতে, সংকল্পকে ব্যক্তিগত কামনার কবল হইতে, তাহার হৃদয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সদা পরিবর্ত্তনশীল আবেগ সকলের বন্ধন হইতে, প্রাণকে ক্ষুদ্র ব্যষ্টি গতানুগতিকতার অধিকার হইতে, আত্মাকে অহমিকার পাশ হইতে মুক্তি দিতেছে, আবার এই নৈর্ব্ব্যক্তিকতাই প্রশান্তি সমতা, উদারতা, সর্ব্বজনীনতা ও আনন্ত্যকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে তাহাদিগকে সমর্থ করিয়া তুলিতেছে। মনে হইতে পারে যে ব্যক্তিত্বই কর্ম্মযোগের প্রধান অবলম্বন, এমন কি প্রায় তাহার উৎস, কিন্তু এখানেও দেখা যায় যে নৈর্ব্ব্যক্তিকতাই অতি সাক্ষাৎভাবে

নিজের পূর্ণতা ও পরমোল্লাসের বিধান আরোপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক আধ্যাত্মিক সত্য ও ন্যায় এই জগতের ভালমন্দকে ত্রুটিপূর্ণ ও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং এক পরমমঙ্গলকে, তাহার সূক্ষ্ম সুষমার সূত্রকে ও তাহার ক্রিয়া সংবেদন ও জ্ঞানের ঊর্দ্ধায়িত ধারাকে অনাবৃত করিয়াছে। কিন্তু এ সবের পশ্চাতে এবং ইহাদেরই মধ্যে সাধক অনুভব করিয়াছে এক দিব্য-পুরুষকে যিনি একাধারে এ সমস্তই, যিনি আলোক ও আনন্দ দাতা, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান, যিনি তাহার সহায়, গুরু, সখা, পিতা, মাতা, যিনি বিশ্বলীলায় তাহার খেলার সাথী, তাহার সত্তার পরম প্রভু, তাহার আত্মার প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ। মানুষের ব্যক্তিত্ব যত প্রকার সম্বন্ধের কথা জানে মানবাত্মার সহিত দিব্য পুরুষের সংস্পর্শের মধ্যে তাহাদের সবগুলিই নিহিত রহিয়াছে ; কিন্তু সে সমস্ত সম্বন্ধ অতিমানবতার স্তরের দিকে উন্নীত হইয়া উঠে এবং মানুষকে দিব্যপ্রকৃতির দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য করে।

পূর্ণযোগের সাধক চায় এক পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও এক পূর্ণাঙ্গ শক্তি, সে চায় যিনি সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বভূতের পশ্চাতে অনন্তরূপে অবস্থিত আছেন তাঁহার সঙ্গে পরিপূর্ণ অখণ্ড এক মিলন। কোন একটা বিশেষ উপলব্ধি ভগবানের কোন এক বিশেষ বিভাবকে—তাহা মানব-মনকে যতই অভিভূত করুক না কেন তাহার সামর্থ্যের পক্ষে যতই পর্য্যাপ্ত বোধ হউক না কেন, একমাত্র বা চরম সত্য বলিয়া যতই সহজে গ্রহণযোগ্য মনে হউক না কেন—শাশ্বত বস্তুর একমাত্র সম্যক সত্য বলিয়া ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করা পূর্ণযোগ সাধকের পক্ষে সম্ভব নহে। তাহার পক্ষে বহুরূপে অভিব্যক্ত ভগবানের অনুভূতি পূর্ণরূপে লাভ করিবার চেষ্টা দ্বারাই অখণ্ড পরমের চরম অনুভূতি গভীরতর ভাবে স্বীকার এবং প্রশস্ততর-রূপে তন্মধ্যস্থ দিব্য সম্পদের উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। একেশ্বরবাদ ও বহু-ঈশ্বরবাদ এ উভয়ের পশ্চাতে গোপন সত্যরূপে যাহা কিছু আছে তাহা পূর্ণ-যোগীর অভীপ্সিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু পরমেশ্বরের মধ্যে তাহাদের গুহ্য সত্যের রহস্য ধরিতে গিয়া তাহাদের সম্বন্ধে মানব মনের দেওয়া বাহ্য বোধ বা ধারণা সাধককে অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। পরস্পর বিবদমান সম্প্রদায় ও দর্শনের লক্ষ্য কি তাহা সে দেখে, সত্যের প্রত্যেকটি বিভাবকে স্বক্ষেত্রে সে স্বীকার করে কিন্তু তাহাদের সঙ্কীর্ণতা ও ভুলভ্রান্তিগুলি বর্জন করিয়া সে অগ্রসর হয় সেই পরম অদ্বয় সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিতে যাহা সত্যের সকল বিভাবকে একসূত্রে গ্রথিত করে। ঈশ্বরকে নররূপে পূজা ও উপাসনার অভিযোগ তাহাকে বিচলিত করেনা—কেননা সে দেখিতে পায় যে এ নিন্দাবাদ আসে অজ্ঞান ও দাম্ভিক তর্কবুদ্ধির কুসংস্কার হইতে, যেখানে

অথবা সত্তার সেই স্থির শাশ্বত অখণ্ড আনন্দে পরিপূরিত হইয়া যাইতে পারে। অজ্ঞান ও অন্ধকারের এই অধস্তন চেতনায় পতন বা নির্ব্বাসনের ভয়শূন্য হইয়া আমরা ভগবানের জ্যোতির্ম্ময় সত্তাতে বাস করিতে পারি, আমাদের অন্তর-পুরুষ তাহার নিজের আলোক, আনন্দ, স্বাতন্ত্র্য এবং একত্বের জগতে অচঞ্চল ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে। এইযোগে বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত অন্য কোন লোকে গিয়া এ অবস্থা লাভ করিলে শুধু চলিবেনা, কিন্তু এখানে ইহজগতেও সেই অবস্থার অনুসরণ ও আবিষ্কার করিতে হইবে, আর ইহা কেবল সম্ভব হইতে পারে দিব্য সত্যকে উপর হইতে নামাইয়া আনিয়া এখানেই অন্তরাত্মাব আপন স্বভাবগত আলোক, আনন্দ, স্বাতন্ত্র্য এবং একত্বের জগৎ প্রতিষ্ঠা দ্বারা। চিৎপুরুষের সহিত আমাদের অন্তরাত্মা যেমন নিবিড় ভাবে যুক্ত হয় ঠিক সেই প্রকার নিবিড় ভাবে চিৎপুরুষের সহিত আমাদের করণ-সত্তার (**instrumental being**) মিলন অবশ্যম্ভাবীরূপে আমাদের অপূর্ণ প্রকৃতিকে দিব্য প্রকৃতির সাদৃশ্য ও প্রতিরূপে রূপান্তরিত করিবে; সে করণ-সত্তাকে তাহার অবিদ্যাজনিত অন্ধ বিকৃত বিকলাঙ্গ বিবদমান গতিবৃত্তি-সমূহ পরিহার করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত আলোক, শান্তি, আনন্দ, সামঞ্জস্য, সার্ব্বভৌমতা, প্রভুত্ব, শুচিতা ও পূর্ণতার দিব্য বসন পরিধান করিতে হইবে; তাহাকে পরিণত হইতে হইবে দিব্য জ্ঞানের এক আধারে, দিব্য সংকল্পের বীর্য্যের ও সত্তার শক্তির এক যন্ত্রে এবং দিব্য প্রেম আনন্দ ও সৌন্দর্য্যধারার এক প্রণালীতে। এই রূপান্তরসাধন করিতে হইবে, আমরা আজ যাহা আছি অথবা যাহা আছি মনে করি তাহার সব কিছুর এক সর্ব্বাঙ্গীণ রূপান্তরসাধন, কালের মধ্যস্থিত সসীম সত্তার সহিত শাশ্বত অসীমের যোগ বা মিলন দ্বারা।

এই সমস্ত দুরূহ পরিণাম পরিপূর্ণভাবে সিদ্ধ হইতে পারে শুধু যদি সত্তার একটা বিশাল রূপান্তর ঘটে, যদি আমাদের সমগ্র চেতনার বিপরীতমুখী একটা আমূল বিপর্য্যয় বা পরিবর্ত্তন দেখা দেয়, যদি আমাদের প্রকৃতির পূর্ণ অলৌকিক রূপান্তর সাধিত হয়। এজন্য প্রয়োজন আমাদের সমগ্র সত্তার ঊর্দ্ধায়ন, প্রয়োজন তাহার নিজের সাধন যন্ত্র বা করণাবলি এবং পরিবেশের দ্বারা ব্যাহত-গতি ও শৃঙ্খলিত জীবসত্তার শুদ্ধ মুক্ত পরম পুরুষের মধ্যে উত্থান, আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার মধ্যে আমাদের অন্তরাত্মার ঊর্দ্ধারোহণ, প্রদীপ্ত কোন অতিমানসের দিকে মনের উন্নয়ন, এক বিরাট অতি-প্রাণের (**super-life**) অভিমুখে প্রাণের উত্তরণ, এমন কি তাহার নিজের উৎসস্বরূপ শুদ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গীণ কোন চিন্ময়তর আত্ম-ধাতুর সহিত যোগসাধনের জন্য আমাদের জড় দেহেরও এক ঊর্দ্ধগতি। আবার ইহা একবারে দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধারোহণ হইতে পারে না;

নূতন আধ্যাত্মিকতার দ্বারা তাহাকে উজ্জীবিত ও তাহার সকল বৃত্তিকে ঊর্দ্ধা-য়িত করিয়া তোলা, যাহাতে বাহ্য দৃষ্টিতে তাহারা পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই রহিয়া যাইবে কিন্তু ভিতরে তাহাদের প্রকৃতিতে এবং সুতরাং আন্তর তাৎপর্য্যে তাহারা পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিবে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর অথবা অন্তরাবৃত্ত রসোন্মত্ত আপনভোলা ধ্যানরসিক সাধকগণের দেওয়া চরম সমাধান স্পষ্টতঃ পূর্ণযোগের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত ; কেননা এই জগতের মধ্যেই যদি ভগবানকে উপলব্ধি করিতে বা পাইতে হয় তাহা হইলে জাগতিক কর্ম্ম বা কর্ম্মমাত্রকে একেবারে পরিহার করিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে না। তদপেক্ষা একটু নিম্নস্তরে প্রাচীন কালের ধার্ম্মিকমনের দেওয়া বিধান এই যে সাধক কেবল সেই সমস্ত কর্ম্ম করিতে পারে যাহা তাহাদের প্রকৃতিতে ভগবানের এষণার বা তাহার সেবা ও পূজার অঙ্গ কিম্বা তাহার আনুষঙ্গিক, তাহা ছাড়া সাধারণ-ভাবে জীবনযাত্রার জন্য যতটুকু অপরিহার্য্য ততটুকু মাত্র কর্ম্ম করিবার অধিকার সে বিধানে তাহাকে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহাও অন্তরে ধর্ম্মভাব লইয়া ঐতিহ্যগত ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে করিতে হইবে। কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে মুক্ত আত্মার পরম চরিতার্থতা এই রূপ অত্যন্ত অনুষ্ঠানপয়ারণ বিধানের দ্বারা হইতে পারে না ; তাহা ছাড়া একমাত্র যে পারত্রিক জীবন তখনও এ বিধানের চরমলক্ষ্যে রহিয়াছে এই জাগতিক জীবন হইতে সেই জীবনে উঠিবার পথের সমস্যা সমাধানের জন্য ইহা স্পষ্টতঃ স্বীকৃত একটা সাময়িক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। পূর্ণযোগ বরং গীতার এই উদার নির্দ্দেশের দিকে অধিক পরিমাণে ঝুঁকিয়া পড়িবে যে সত্যের মধ্যে বাস করিয়া মুক্ত আত্মাও সকল কর্ম্মই এমনভাবে করিয়া যাইবেন যাহাতে গোপন দিব্যশক্তি পরিচালিত জাগতিক বিকাশ ধারার পরিকল্পনা ব্যাহত ও খর্ব্ব না হয়। কিন্তু যদি সকল কর্ম্মই বর্ত্তমানে অবিদ্যার মধ্যে যেরূপ চলিতেছে সেই একই রূপে একই ধারায় সাধিত হইতে থাকে, তবে আমাদের লাভ হইবে শুধু অন্তরের দিকে এবং আমাদের বাহ্য জীবনে এমন এক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিবে যাহাতে তাহা অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক ক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে, তাহা হইলে আন্তর জ্যোতিকে আমাদের বাহ্য প্রকৃতির ক্ষীণ প্রদোষালোকে কর্ম্ম করিতে হইবে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিৎপুরুষকে তাহার নিজস্ব প্রকৃতির পক্ষে যাহা বিসদৃশ এমন এক অপূর্ণ আধারের মধ্যে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতে হইবে। যদি কিছু কাল এত-দপেক্ষা সুন্দর কিছু করা না যায়—এবং পর্ব্বান্তর সংক্রমণের সময় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এইরূপ ঘটা অবশ্যম্ভাবী—তাহা হইলে এই অবস্থাকে চলিতে দিতে হইবে যতদিন না প্রস্তুতি শেষ হইতেছে এবং অন্তরস্থ পুরুষ দেহের ও বাহ্য

জগতের জীবনের উপর নিজ রূপের ছাপ ফেলিবার মত উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় না করিতেছে; কিন্তু ইহা পরিবর্ত্তনকালীন ব্যবস্থার একটা সোপান মাত্র রূপে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাকে আমাদের অন্তরাত্মার আদর্শ বা আমাদের পথের চরম লক্ষ্য বলিয়া মানিয়া লওয়া চলিবে না।

সেই একই কারণে নীতি দ্বারা দেওয়া সমাধান পূর্ণ হইতে পারে না; কেননা নীতির বিধান প্রকৃতির দুর্ব্বৃত্ত অশ্বগুলির মুখে কাঁটা-লাগাম পরায় মাত্র এবং বহুকষ্টে কেবল আংশিক ভাবে তাহাদিগকে শাসন ও নিযন্ত্রণ করে, কিন্তু এরূপ-ভাবে রূপান্তর সাধন করিবার শক্তি তাহার নাই যাহাতে প্রকৃতি দিব্য আত্মজ্ঞান হইতে জাত বোধির প্রেরণা সিদ্ধ ও চরিতার্থ করিয়া স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে চলিতে পারে। নীতি বড় জোর একটা সীমা নির্দ্দেশ করিতে, শয়তানকে দমিত করিয়া রাখিতে এবং আমাদের চারিদিকে যেমন তেমন গোছের এক দেওয়াল গড়িয়া তুলিতে পারে যাহাকে কোনক্রমেই নিরাপদ বলা চলেনা। সাধারণ জীবনে অথবা যোগের পথে আত্মরক্ষার জন্য এই বা এই ভাবের একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা কিছু কালের জন্য আবশ্যক হইতে পারে; কিন্তু যোগমার্গে ইহা হইবে শুধু পরিবর্ত্তন কালের এক নিদর্শন মাত্র। এক আমূল রূপান্তর সাধন এবং শুদ্ধ ও উদার এক আধ্যাত্মিক জীবন প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য, আর যদি সে লক্ষ্যে পৌঁছিতে হয় তাহা হইলে আমাদিগকে এক গভীর-তর সমাধান, অতিনৈতিক সক্রিয় ও ধ্রুবতর এক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইবে। অন্তরে আধ্যাত্মিক এবং বহির্জীবনে নৈতিক হওয়া—ইহাই সাধারণ ধর্ম্মের সমাধান কিন্তু তাহা একটা গোঁজামিল মাত্র; আমরা চাই আন্তর সত্তা ও বহি-র্জীবন এ উভয়ের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা, বহির্জীবন ও চিৎসত্তার মধ্যে এক আপোষ রফা আমাদের লক্ষ্য নহে। মানুষ তাহাদের যথার্থ মূল্যের সম্বন্ধে গোলমাল করিয়া আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের পার্থক্য মুছিয়া ফেলে এবং এমন কি নীতিবোধই আমাদের প্রকৃতির যথার্থ আধ্যাত্মিক উপাদান ইহা দাবি করে, কিন্তু এ ব্যবস্থাও আমাদের সাধনায় কোন কাজে লাগে না; কেননা নীতি একটা মানসিক সংযম মাত্র এবং সীমিত ভ্রমশীল মন মুক্ত ও চিরদীপ্ত অন্তরাত্মা নয় এবং হইতে পারে না। তেমনই সেই সিদ্ধান্তকে মানিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব যাহা প্রাণকেই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে, প্রাণের উপাদানসমূহ বর্ত্তমানে মূলতঃ যাহা আছে তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়া তাহা-দিগকে বিভূষিত ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য এক অর্দ্ধ বা কৃত্রিম আধ্যা-ত্মিকতাকে শুধু আবাহন করে। তাহা ছাড়া সে ব্যবস্থাও অপ্রচুর সুতরাং আমাদের গ্রহণের অযোগ্য যাহাতে প্রাণ ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটা বিসদৃশ

সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা অনেক সময় করা হয়—যাহাতে ভিতরে এক নিগূঢ় মরমীয়া অনুভূতির সঙ্গে বাহিরে থাকে রসাস্বাদলিপ্সু বুদ্ধিভাবিত ইন্দ্রিয়সুখানুরাগী এক প্রকৃতি-উপাসনা অথবা উন্নত ধরণের এক ভোগসুখবাদ, যাহা সেই অনুভূতির দিকে ঝুঁকিয়া থাকে এবং আধ্যাত্মিক সমর্থনের আভায় নিজেকে পরিতৃপ্ত মনে করে; কেননা এ ব্যবস্থাও অনিশ্চিত ও নিষ্ফল একটা গোঁজামিল এবং ইহা দিব্য সত্য ও তাহার পূর্ণাঙ্গতা হইতে ততদূরে অবস্থিত যতদূরে অবস্থিত ইহার বিপরীত কঠোর নৈতিকতাবাদ। যে ভ্রমশীল মানব-মন উচ্চ আধ্যাত্মিক শিখরের সহিত নিম্নস্থিত সাধারণ মন ও প্রাণ যাহা চায় তাহার যোগসাধন করিবার সূত্র অন্ধের মত ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়ায়, এ সমস্ত তাহারই বিভ্রান্ত সমাধান। ইহাদের পশ্চাতে যেটুকু আংশিক সত্য গুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছে তাহা কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হইবে যখন তাহা অধ্যাত্মক্ষেত্রে উন্নীত, পরম সত্য চেতনা দ্বারা পরীক্ষিত এবং অজ্ঞানের ক্ষেত্র ও ভ্রম হইতে মুক্ত করা হইবে।

মোট কথা এই যে ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে ততদিন সাময়িক ভাবে ছাড়া কোন স্থায়ী বা পূর্ণাঙ্গ সমাধান হইতে পারেনা, যতদিন আমরা অতিমানস সত্য-চেতনায় পৌঁছিতে না পারিতেছি, যেখানে বস্তুর বাহ্যরূপের যথাযথ মূল্যাঙ্কন ও তাহার সার সত্য প্রকট হয় এবং সেই সত্যের মধ্যে মূলগত আধ্যাত্মিক প্রকৃতি হইতে যাহা উদ্ভূত হয় তাহাও প্রকাশিত হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে আমাদের নিরাপত্তার একমাত্র উপায় হইবে আধ্যাত্মিক অনুভূতিব পরিচালনসমর্থ একটি বিধান খুঁজিয়া বাহির করা, নতুবা অন্তরে এমন এক আলোক মুক্ত করা যাহা আমাদিগকে আপাততঃ পথ দেখাইয়া লইয়া চলিবে যতদিন ঊর্দ্ধস্থিত সেই বৃহত্তর ঋতচিৎকে অপরোক্ষভাবে প্রাপ্ত হইতে না পারি অথবা যতদিন পর্য্যন্ত তাহা আমাদের মধ্যে সঞ্জাত না হয়। কারণ আমাদের মধ্যে বাকি যাহা কিছু শুধু বাহ্য, যাহা কিছু আধ্যাত্মিক বোধ বা দর্শন নহে, অর্থাৎ যাহা কিছু বুদ্ধির পরিকল্পনা প্রতিরূপ বর্ণনা ও সিদ্ধান্ত, প্রাণশক্তির ব্যঞ্জনা বা প্ররোচনা, জড় বস্তুর দুর্ব্বার প্রয়োজনীয়তা—তাহারা সকলেই কখনও বা অর্দ্ধ আলোক, কখনও বা মিথ্যা আলোক, যাহা বড় জোর কিছু কাল পর্য্যন্ত অথবা আংশিকভাবে আমাদের কাজে লাগে কিন্তু অধিকাংশ সময় আমাদিগকে আটক করিয়া রাখে অথবা হতবুদ্ধি করিয়া দেয়। মানবচেতনাকে দিব্য-চেতনার দিকে খুলিয়া ধরিবার ফলেই শুধু আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরিচালনার বিধান আমরা লাভ করিতে পারি; এজন্য দিব্যশক্তির ক্রিয়াধারা, অনুজ্ঞা এবং সক্রিয় সদ্‌ভাবনা বা সান্নিধ্যবোধ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আমাদের থাকা

বিশ্বগত পুরুষের কর্ম্মকে এমন কি তাহার স্বপ্নকে—যদিও বা তাহা স্বপ্নই হয় —ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিবে না বা সে সঙ্কোচবশে পিছাইয়া পড়িবে না সেই বিরাট কর্ম্ম ও বহুমুখী বিজয় গৌরব হইতে যাহা তিনি নিজের কাছে মানবরূপী প্রাণীর জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এই উদারতার প্রথম সর্ত্তই হইবে এই যে জগতেও আমাদের কর্ম্ম হইবে সেই মহাযজ্ঞের অংশ, সম্যক্ মনোভাব ও সম্যক্ জ্ঞানের সঙ্গে যাহা সর্ব্বোত্তমের নিকট উৎসৃষ্ট হইয়াছে, অপর কাহারও নিকটে নয় ; উৎসৃষ্ট হইয়াছে সেই দিব্যশক্তির নিকট অপর কোন শক্তির নিকট নয়, আর তাহা উৎসৃষ্ট হইয়াছে মুক্ত স্বাধীন আত্মার দ্বারা, জড়প্রকৃতির মোহমুগ্ধ দাসের দ্বারা নয়। কর্ম্মের মধ্যে কোন বিভাগ যদি করিতেই হয় তবে তাহা হইবে যে-সমস্ত কর্ম্ম পবিত্র হোমাগ্নির হৃৎকেন্দ্রের অতি নিকটে অবস্থিত এবং যে-সমস্ত কর্ম্ম অধিকতর দূরবর্ত্তী বলিয়া সে অগ্নির অতি অল্প সংস্পর্শে আসিয়াছে অথবা তাহার দ্বারা স্বল্প পরিমাণে আলোকিত হইয়াছে, এই উভয়-বিধ কর্ম্মের মধ্যে ; অথবা বিভাগ করা হইবে যে সমিধ্ অগ্নিতে প্রবল ও উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছে আর সেই সমস্ত কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে যাহাদিগকে যদি বেদীর উপর স্তূপীকৃতভাবে রাখা হয় তবে তাহাদের আর্দ্রতা, গুরুভার এবং পরিব্যাপ্ত প্রাচুর্য্যের দ্বারা অগ্নির উদ্দীপনা ব্যাহত করিতে পারে। কিন্তু এই প্রভেদের কথা ছাড়িয়া দিলে যাহা সত্যকে খোঁজে বা প্রকাশ করে জ্ঞানের সেইরূপ সকল কর্ম্মই পরিপূর্ণভাবে যজ্ঞ বা নিবেদনের উপযুক্ত উপাদান ; দিব্যজীবনের বিশাল কাঠামো হইতে তাহাদের কোনটাই বাদ দেওয়ার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা নাই। যে সকল মনোবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান বস্তুর রূপ বিধান ও ক্রিয়াধারার সম্বন্ধে আলোচনা করে, যে সমস্ত বিদ্যা মানুষ বা পশুর জীবন সম্বন্ধে গবেষণা করে, মানুষের সমাজ রাষ্ট্র ভাষা ও ইতিহাস লইয়া বিচার করে, যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা সেই সকল প্রচেষ্টা ও ক্রিয়াধারা রাজিকে জানিতে ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়, যাহা দ্বারা মানুষ তাহার জগৎ ও পরিবেশের উপর প্রভুত্বস্থাপন ও তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়, যে নানাপ্রকার মহান ও সুকুমার ললিত কলা একাধারে কর্ম্ম ও জ্ঞান এ উভয়েরই সমুচ্চয়—কেননা সুরচিত বা সুগঠিত ও সার্থক প্রত্যেক কবিতা চিত্র মূর্ত্তি বা অট্টালিকা সৃজনী প্রতিভারই এক কাজ, চেতনার জীবন্ত এক আবিষ্কার, সত্যের এক মূর্ত্তি, মানুষের মন প্রাণের অথবা বিশ্বপ্রকৃতির আত্মপ্রকাশের সক্রিয় এক রূপ—অর্থাৎ যাহা কিছু সন্ধান করে, যাহা কিছু সন্ধান পায়, যাহা কিছু রূপ বা ধ্বনির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে সে-সমস্তই এক অনন্ত শাশ্বতবস্তুর লীলার কিয়দংশের অভিব্যক্তি, তাহা-দিগকে সেই পরিমাণে ঈশ্বরোপলব্ধি বা দিব্য রূপায়ণের সাধন করিয়া তোলা

ঠিক কি ভাবে বা কোন সোপান পরম্পরার মধ্য দিয়া এই উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইবে তাহা ব্যক্তিগত প্রকৃতির রূপ, তাহার প্রয়োজন ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিবে। আধ্যাত্মিক রাজ্যে মূলবস্তু সর্ব্বদাই এক; তথাপি তাহার রূপবৈচিত্র্যও অনন্ত; অন্ততঃ পূর্ণযোগে বাঁধাধরা মনোময় নিয়মের কঠোরতা প্রযুক্ত হইতে পারে না; কেননা দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতি যখন একই লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে তখনও তাহারা ঠিক একই ধারা অবলম্বন করে না, একইভাবে পদক্ষেপ করে না, অথবা তাহাদের উন্নতিতে ঠিক একই প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া চলে না। তবু মোটামুটি বলা যায় যে প্রগতিপথের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একটা যুক্তিসঙ্গত অনুক্রম এই প্রণালীতেও আছে। প্রথমে আসে একটা বৃহৎ পরিবর্ত্তন যাহাতে ব্যক্তিগত প্রকৃতির সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়াধারাকে গ্রহণ করিয়া উপরের দিকে ফিরাইয়া ধরা হয় অথবা কোন উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং যিনি আমাদের অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষ, যিনি যজ্ঞের হোতা তিনি তাহাদিগকে উৎসর্গ করেন ভগবানের সেবাতে; তাহার পর সত্তার ঊর্দ্ধারোহণের এক প্রচেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টার ফলে লব্ধ কোন নূতন উচ্চতর চেতনার উপযোগী শক্তি ও দীপ্তিকে আমাদের জ্ঞানের সমগ্র ক্রিয়াধারার মধ্যে নামাইয়া আনিবার সাধনা চলে। এখানে চেতনার কেন্দ্রগত আন্তর রূপান্তর সাধনের জন্য সাধককে গভীররূপে অভিনিবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, তখন মনোময় জীবনের বহির্ম্মুখী গতিবৃত্তির এক বৃহদংশকে হয় ত্যাগ করিতে, না হয় ক্ষুদ্র ও গৌণ করিয়া রাখিতে হয়। পরে সাধনার বিভিন্ন স্তরে অন্তরের চৈত্যসত্তা বা অধ্যাত্ম পুরুষের নূতন চেতনা তাহাদের গতিবৃত্তির মধ্যে কত পরিমাণে আনিতে পারা যায় তাহা দেখিবার জন্য সময় সময় সেই পরিত্যক্ত জীবনকে বা তাহার কোন কোন অংশকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারা যায়; কিন্তু যাহা মানুষকে এ-কাজ কি সে-কাজ করিতে এবং করণীয় কাজ তাহার জীবনের প্রায় অপরিহার্য্য এক অংশ মনে করিতে বাধ্য করে, তাহার স্বভাব বা প্রকৃতির সেই বশ্যতা হ্রাস পাইবে এবং অবশেষে তাহাতে কোন আসক্তি থাকিবে না, নিম্নতর ভাবের কোন বাধ্যবাধকতা বা চালকশক্তি সত্তার মধ্যে কোথাও আর অনুভূত হইবে না। শুধু ভগবান হইবেন তাহার ভাবনা, একমাত্র ভগবান হইবেন তাহার সমগ্র সত্তার অনন্যপ্রয়োজন, যদি তাহার কর্ম্মের পশ্চাতে কোন বাধ্যকর প্রেরণা থাকে তবে তাহা হইবে কোন মহত্তর চেতনা-শক্তির দীপ্ত-প্রেরণা যাহা ক্রমবর্দ্ধমানভাবে তাহার সমগ্র জীবনের একমাত্র চালকশক্তি হইয়া উঠিতেছে, তাহার অন্তর্নিহিত কোন কামনা বা বাহ্য প্রকৃতির কোন তাড়না নহে। অপর-

পক্ষে ইহাও সম্ভব যে তাহার অন্তরের আধ্যাত্মিক প্রগতির পথে যে কোন সময় সে অনুভব করিতে পারে যে তাহার কর্ম্মধারাগুলি সঙ্কুচিত না হইয়া বরং প্রসারতা লাভ করিতেছে; যোগশক্তির অলৌকিক সংস্পর্শে তাহার মধ্যে মনোময় বিসৃষ্টির নব নব সামর্থ্য এবং জ্ঞানের নূতন নূতন ক্ষেত্র উন্মোচিত হইতে পারে। রসবোধ বা সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি, এক কিম্বা যুগপৎ বহু ক্ষেত্রে শিল্পকলা সৃষ্টির সামর্থ্য, সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিভা বা কুশলতা, দার্শনিক ভাবনা ও ধারণার বৃত্তি, চক্ষু কর্ণ হস্ত বা মনের কোন শক্তি—ইহাদের কোনটাই যে-আধারে পূর্ব্বে দেখা যাইত না সেখানে এ সমস্ত জাগিয়া উঠিতে পারে। অন্তর্য্যামী ভগবান, আমাদের সত্তার গভীর প্রদেশে যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য লুক্কায়িত ছিল তাহা হইতে তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া প্রকাশ করিতে পারেন অথবা ঊর্দ্ধ্ব হইতে এক দিব্যশক্তি, তাহার বীর্য্যধারা আমাদের করণাত্মক প্রকৃতির উপর ঢালিয়া দিয়া তাহাকে সেই সমস্ত কার্য্য বা সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারেন, যাহার জন্য প্রণালী বা রচয়িতা রূপে সে অভিপ্রেত। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত যোগেশ্বর যে পদ্ধতি বা প্রগতির যে-ধারাই বাছিয়া লউন না কেন এই সোপানের সাধারণ শেষ পরিণতিতে ঊর্দ্ধ্বে অবস্থিত তিনিই যে আমাদের মনের সকল গতিবৃত্তির এবং আমাদের জ্ঞানের সকল কর্ম্মের প্রযোজক নির্দ্ধারক ও রূপকার এই চেতনাই বর্দ্ধমানভাবে জাগিয়া উঠিবে।

চিৎস্বরূপের জ্যোতিতে প্রথমতঃ আংশিক পরে পূর্ণরূপে ক্রিয়া করিয়া অজ্ঞান হইতে মুক্ত চেতনার ধারাতে প্রবিষ্ট হইবার পথে সাধকের জ্ঞানময় মন ও জ্ঞানময় কর্ম্মের রূপান্তরের দুইটি লক্ষণ দেখা যায়। প্রথমে চেতনার একটা কেন্দ্রগত পরিবর্ত্তন আসে এবং পরাৎপর পুরুষের ও বিশ্বসত্তার, স্বরূপে স্থিত ঈশ্বরের ও সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত ভগবানের বর্দ্ধমান এক সাক্ষাৎ উপলব্ধি, দর্শন ও অনুভূতিলাভ হয়; প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ ইহাতে সাধকের মন ক্রমশঃ অধিক-তররূপে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িবে এবং অনুভব করিবে যে তাহা ঊর্দ্ধ্বে ও চারি-দিকে উন্নীত ও প্রসারিত হইয়া এই একমাত্র মৌলিক জ্ঞানের অভিব্যক্তির ক্রমবর্দ্ধমান জ্যোতির্ম্ময় সাধন হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু কেন্দ্রগত চেতনাও তাহার দিক হইতে দিন দিন অধিকতররূপে জ্ঞানের বাহ্য মনোময় ক্রিয়াধারা-গুলিকে অধিকার করিবে, তাহাদিগকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইবে অথবা নিজের অধিকৃত প্রদেশে পরিণত করিবে, তাহাদের মধ্যে নিজের খাঁটি গতি-বৃত্তি সঞ্চারিত করিবে, বর্দ্ধিষ্ণুভাবে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ও আলোকিত মনকে, যেমন নিজের গভীরতর চিন্ময় সাম্রাজ্যে তেমনি এই সমস্ত প্রকৃতির নববিজিত

সকল ক্রিয়াকে প্রথমতঃ উন্নত ও বিশাল, তাহার পরে তাহাদিগকে দীপ্ত ও উজ্জ্বল করিয়া উচ্চতর বুদ্ধির রাজ্যে তুলিয়া লইতে হইবে; পরে আবার তাহাদিগকে মনের অতীত বৃহত্তর এক সম্বোধির ক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত এবং তাহারও পরে অধিমানসের অমিতবীর্য্য জ্যোতিঃপ্রপাতে পরিণত করিতে এবং সর্ব্বশেষে তাহাদিগকে অতিমানস বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ পরা দীপ্তি ও সর্ব্বজয়ী শক্তিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে। জগতে ক্রমবিকাশশীল চেতনা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত কিন্তু গোপন ও অব্যক্ত বীজাকারে প্রকৃতির প্রবল সাধনধারার অন্তরে তীব্র এষণাময় উদ্দেশ্যরূপে ইহাকেই বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছে এবং যতদিন চিৎস্বরূপের বর্ত্তমান অপূর্ণ অভিব্যক্তির স্থানে তাহার পূর্ণ প্রকাশের উপযোগী যন্ত্রসকল গড়িয়া না উঠিতেছে ততদিন সে সাধনধারা, সে পরিণতি থামিতে পারে না।

জ্ঞান যদি চেতনার উদারতম শক্তি এবং মুক্তি ও দীপ্তি দানই যদি তাহার কর্ম্ম হয় তাহা হইলেও প্রেম সেই চেতনার গভীরতম ও তীব্রতম বৃত্তি যাহার আছে দিব্যরহস্যের গূঢ়তম ও অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশের চাবিকাঠি হওয়ার শ্রেষ্ঠ অধিকার। মানুষ মনোময় সত্তা বলিয়া ভাবনাময় মন ও তাহার যুক্তি-বিচার ও সংকল্পকে এবং মন যে ভাবে সত্যের সম্মুখীন হয় ও যে ভাবে তাহাকে সংশোধিত করিয়া তোলে তাহাদিগকে সে উচ্চতম মর্য্যাদা দিতে চায়, এমন কি এ-কার্য্য আর কোন বৃত্তি দ্বারা যে সাধিত হইতে পারে ইহা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হয়। বুদ্ধির দৃষ্টিতে হৃদয় ও তাহার ভাবাবেগ এবং অননুমেয় গতিবৃত্তি হইল এরূপ এক অন্ধকারাচ্ছন্ন শক্তি যাহার উপর নির্ভর করা যায় না, যাহা প্রায়ই মানুষকে বিপদে ফেলে ও বিপথে লইয়া যায়, তাই যুক্তিবুদ্ধি ও মনোময় সংকল্পের দ্বারা তাহাকে সংযত রাখিবার প্রয়োজন আছে। তথাপি ইহা সত্য যে হৃদয় বা তাহার পশ্চাতে গভীরতর রহস্যময় এক আলোক আছে যাহা আমরা যাহাকে বোধি বলি তাহা না হইলেও—কেননা বোধি যদিও মন হইতে উদ্ভূত হয় না তবু মনের মধ্য দিয়াই নামিয়া আসে—তাহার সঙ্গে সত্যের এক সাক্ষাৎ সংস্পর্শ আছে; আর জ্ঞানগর্ব্বে মুগ্ধ মানুষী বুদ্ধি অপেক্ষা তাহা ভগবানের অনেক বেশি নিকটে। প্রাচীন শিক্ষা অনুসারে সর্ব্বগত দিব্য পুরুষের আসন মানুষের রহস্যময় হৃদয়ে, উপনিষদের ভাষায় "হৃদয়ে-

আর প্রতি পদে আপন সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করিতেছে না, যখন প্রাণ স্থির এবং বশীভূত হইয়াছে আর নিজের অপরিণামদর্শী সঙ্কল্প দাবি ও ও বাসনা পূরণের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে না, যখন দেহের এতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে যাহাতে তাহা বহির্ম্মুখীনতা অন্ধকার ও জড়তা দ্বারা অন্তরের শিখাকে পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন রাখিতেছে না, তখন যাহার প্রভাব আমরা কদাচ কখনও অনুভব করিয়াছি সেই নিগূঢ় অন্তরতম সত্তা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে, বাকি সকল অংশকে আলোকিত করিতে এবং সাধনার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় সত্তার স্বভাবই এই যে তাহা একমুখী হইয়া ভগবানের বা সর্ব্বোত্তমের দিকে সর্ব্বদা ফিরিয়া রহিয়াছে—একমুখী অথচ কার্য্য ও গতি-বৃত্তিতে নমনীয় বা সাবলীল ; একমুখী বুদ্ধিবৃত্তির মত তাহা কঠোর অনমনীয়তা অথবা একমুখী প্রাণশক্তির মত প্রভুত্বকারী ভাবনা বা তাড়নার এক গোঁড়ামী বা অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে না ; প্রতিমুহূর্ত্তে তাহা এক নমনীয় নিশ্চয়তার সহিত সত্যের পথ দেখাইয়া দেয়, ভ্রান্ত ও খাঁটি পদক্ষেপের মধ্যে পার্থক্য স্বতঃই দর্শন করে, অদিব্য বস্তুরাজির দুর্ম্মোচনীয় সংমিশ্রনের মধ্য হইতে দিব্য বা ভগবদভিমুখী গতিবৃত্তিকে মুক্ত করিয়া দেয়। তাহা আমাদের প্রকৃতির যে যে অংশ রূপান্তরিত করিতে হইবে তাহাদিগকে সন্ধানী বৈদ্যুতিক আলোকের (**search light**) মতই দেখাইয়া দেয ; তাহার মধ্যে সংকল্পের এক প্রজ্বলন্ত শিখা আছে যাহা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে পূর্ণতা লাভের এবং আন্তর ও বাহ্য জীবনের ঊর্দ্ধায়িত রূপান্তর সাধনের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট। তাহা দিব্য সত্যস্বরূপকে সর্ব্বত্র দেখিতে পায় কিন্তু যাহা কেবল তাহার মুখোশ ও ছদ্মাবেশ তাহা বর্জন করে। এই অন্তরাত্মা জোর দেয় সত্যের উপর, সংকল্প সামর্থ্য ও প্রভুত্বের উপর, প্রেম আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের উপর ; কিন্তু সে সত্য হইবে নিত্য জ্ঞানের স্থায়ী সত্য, যাহা অবিদ্যার কেবল ক্ষণস্থায়ী বাস্তব সত্যকে অতিক্রম করিয়াই শুধু লাভ হইতে পারে ; সে আনন্দ হইবে অন্তরের আনন্দ বাহিরের প্রাণগত সুখ শুধু নহে—কেননা চৈত্যপুরুষ বরং চায় সেই দুঃখ তাপ যাহা বিশুদ্ধি আনয়ন করে তবু চায় না তেমন সুখ যাহা আমাদিগকে অশুদ্ধি ও অবনতির দিকে লইয়া যায়—আবার সে যে প্রেম চায় তাহা ঊর্দ্ধের দিকে উন্নয়নশীল যাহা অহংগত বাসনার খুঁটিতে আবদ্ধ নয় অথবা যাহার পদদ্বয় পঙ্কে নিমগ্ন নয় ; যে সৌন্দর্য্য সে চায় তাহা হইবে শাশ্বতের সম্যক্ অভিব্যঞ্জনার পুরোহিত, আর যে শক্তি সংকল্প ও প্রভুত্ব তাহার কাম্য তাহা হইবে চিৎপুরুষের যন্ত্র, অহমিকার নয়। তাহার সংকল্প হইবে জীবনকে দিব্যরূপ দান, জীবনের মধ্য

দিয়া এক উচচতর সত্যের অভিব্যক্তি আর শাশ্বত ভগবানের নিকট সে জীবনের উৎসর্গ।

কিন্তু চৈত্যপুরুষের অন্তরঙ্গতম স্বভাব হইল পবিত্র প্রেম, আনন্দ ও তাদাত্ম্য-বোধের মধ্য দিয়া ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হওয়া। এই দিব্য প্রেমই তাহার মুখ্য সন্ধানের বস্তু, ইহাই তাহার প্রণোদক শক্তি তাহার চরম লক্ষ্য, সত্যের ধ্রুবতারা যাহা আমাদের জায়মান দেবতার জ্যোতির্ম্ময় গুহার অথবা আমাদের মধ্যস্থ নবজাত পরমদেবতার এখনও প্রচ্ছন্ন দোলার উপর আলোকবর্ষণ করিতেছে। তাহার পরিণতির এবং অপরিণত জীবনের প্রাথমিক দীর্ঘস্তরে তাহাকে নির্ভর করিতে হয় পার্থিব ভালবাসা স্নেহ কোমলতা শুভেচ্ছা অনুকম্পা জনহিতৈষণার উপর, ইহজগতে যত সৌন্দর্য্য সৌকুমার্য্য মাধুর্য্য যত আলোক শৌর্য্য ও বীর্য্য আছে তাহাদের উপর, যাহা কিছু মানবপ্রকৃতির প্রকৃত ভাব ও স্থূলতাকে বিশোধিত ও পরিমার্জিত করিতে সাহায্য করিতে পারে তাহাদের সকলের উপর ; কিন্তু সে জানে যে তাহাদের অত্যুত্তম অবস্থায়ও এ সমস্ত মানুষী গতিবৃত্তি কতটা বিমিশ্র আর তাহাদের নিম্নতম অবস্থায় তাহারা কতটা অধঃপতিত এবং তাহাদের উপর কতটা ছাপ পড়িয়াছে অহমিকার ও আত্মপ্রবঞ্চক আবেগময় মিথ্যার, আর তাহার সহিত কতটা জড়ীভূত হইয়া আছে আত্মার গতিবৃত্তির অনুসরণকারী নিম্নতর সত্তার লাভ ও স্বার্থসিদ্ধির প্রবৃত্তি। আত্মপ্রকাশ করিয়াই সে প্রাচীন সকল বন্ধনকে অপূর্ণ ভাব-আবেগের সকল ক্রিয়াধারাকে ভাঙ্গিয়া দিতে এবং তাহাদের স্থানে প্রেম ও একত্বের বৃহত্তর আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রস্তুত ও উৎসুক হয়। তখনও সে মানবসুলভ মূর্ত্তি ও গতিবৃত্তিকে হয়ত স্থান দিতে পারে কিন্তু কেবল এই সর্ত্তে যে তাহারা একমাত্র সেই পরম একের অভিমুখী হইবে। যাহা সাধন পথের অনুকূল হইবে শুধু সেই সমস্ত সম্বন্ধবন্ধনকে সে স্বীকার করিবে, স্বীকার করিবে গুরুর প্রতি হৃদয়ের ভক্তি, ঈশ্বরান্বেষুগণের সহিত মিলন ও মৈত্রী, অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানব ও পশু জগতের প্রতি আধ্যাত্মিক অনুকম্পা, সর্ব্বত্র ঈশ্বরানুভূতি জাত আনন্দ হর্ষ ও সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি। তাহার হৃদয়ের গোপনকেন্দ্রে যে সর্ব্বগত ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য সে তাহার সমগ্র প্রকৃতিকে অন্তরে ডুবাইয়া দেয়, আর যতক্ষণ সে আহ্বান সে শুনিতে পায় ততক্ষণ স্বার্থপরতার অপবাদে সে কান দেয় না, কেমলমাত্র বাহ্য কোন পরার্থপরতা, কর্ত্তব্য, জনহিত বা লোকসেবার দাবি তাহাকে ভুলাইতে অথবা তাহার পবিত্র আকূতি ও অন্তরস্থ পরমদেবতার আকর্ষণ হইতে তাহাকে অন্যদিকে ফিরাইতে পারে না। সে তাহার সত্তাকে এক জগদতীত পরম আনন্দের

করিয়া রাখে ; প্রেমের প্রত্যেক গতিকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে হইবে আর তাহা মনের রুচি, প্রাণের রাগ অনুরাগ, দেহের কামনা বাসনার উপর নির্ভর করিবে না, তাহাকে নির্ভর করিতে হইবে আত্মার সঙ্গে আত্মার পরিচয়ের উপর—প্রেমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাহার আধ্যাত্মিক ও চৈত্যিক মূল ভিত্তির উপর, মন প্রাণ ও দেহ সেই মহান একত্বের আত্মপ্রকাশের যন্ত্র ও উপাদান মাত্র হইয়া থাকিবে। এই রূপান্তরে ব্যক্তিগত প্রেমও এক স্বাভাবিক উত্তরণের দ্বারা সর্ব্বানুস্যূত পরম একের দ্বারা অধিকৃত দেহ মন ও আত্মার মধ্যে অধিষ্ঠিত বিশ্বাত্মার, দিব্যপুরুষের প্রতি দিব্য প্রেমে পরিণত হইবে।

বস্তুতঃ অনুরাগ ও পূজায় ভরা সকল প্রেমের পশ্চাতে এক আধ্যাত্মিক শক্তি আছে ; এমন কি যখন সে প্রেম অজ্ঞানবশে কোন সসীম পাত্রে অর্পিত হয় তখন সে অনুষ্ঠানের দৈন্য ও তাহার পরিণামের ক্ষুদ্রতার মধ্য দিয়াও সেই মহিমার একটা ছটা বাহির হয়। কেননা আরাধনাত্মক প্রেম যুগপৎ এক অভীপ্সা ও এক প্রস্তুতি ; সে প্রেম তাহার অবিদ্যাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেও ক্ষণেকের জন্য এমন উপলব্ধি আনিতে পারে যাহা অল্পবিস্তর অন্ধ ও অপূর্ণ হইলেও এক অপরূপ বস্তু ; কেননা উপলব্ধির এই সমস্ত মুহূর্ত্তে আমরা নহি কিন্তু সেই পরম একই আমাদের মধ্যে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ হইয়া দাঁড়ান এবং এই অনন্ত প্রেম ও প্রেমিকের ক্ষীণ আভাসে মানুষী অনুরাগও ঊর্দ্ধায়িত ও মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে। এই কারণেই দেবদেবীর অর্চ্চনা, প্রতিমার পূজা, আকর্ষণের বস্তুরূপে কোন মানুষের বা আদর্শের আরাধনাকে অবজ্ঞা করা যায় না ; কেননা এ সমস্ত হইল সোপানাবলি যাহাদের মধ্য দিয়া মানবজাতি অনন্তের সেই পরম অনুরাগ ও পরম আনন্দের দিকে অগ্রসর হয়; এ সমস্ত সেই অনন্তকে সীমিত করে বটে, তথাপি প্রকৃতি যে সমস্ত অধস্তন সোপান আমাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে তাহা এখনও যখন আমাদিগকে ব্যবহার এবং আমাদের অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর রূপে স্বীকার করিতে হইবে তখন আমাদের অপূর্ণ দৃষ্টির নিকট তাহারাই সে অনন্তের প্রতীকরূপে কার্য্য করে। আমাদের আবেগময় সত্তার পরিপুষ্টি ও পরিণতির জন্য কোন না কোন প্রকার মূর্ত্তি বা প্রতীকের পূজা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন, আর এই সত্য যে মানুষ জানে সে যতক্ষণ পূজকের হৃদয়স্থ মূর্ত্তি যাহার প্রতীক সেই পরমসদ্বস্তুকে তাহার স্থানে না বসাইতে পারিবে ততক্ষণ কখনও সে মূর্ত্তিকে চূর্ণ করিতে ব্যগ্র হইবে না। তাহা ছাড়া, এ সমস্তের এই শক্তি আছে এইজন্য যে ইহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই অন্তর্নিহিত হইয়া এমন একটা কিছু আছে যাহা ইহাদের বাহ্যরূপের চেয়ে

একত্বের এষণা ও একত্ববোধের স্থাপনা করা ; প্রত্যেক কর্ম্মকে ভগবদভিমুখী ভাবাবেগের অথবা ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধের প্রতীক ও অভিব্যক্তি করিয়া তোলা ; আমরা যাহা কিছু করি তাহা ভগবদচর্চনায়, আত্মার সহিত সংযোগস্থাপনায়, মনের তদ্‌বোধে প্রাণের আজ্ঞানুবর্ত্তিতায় হৃদয়ের আত্ম-সমর্পণে পরিণত করা—এই সমস্ত ধারা অনুসরণ করিয়া আমরা সমগ্র জীবনকে ভগবৎপূজায় রূপান্তরিত করিতে পারি।

যে কোন ধর্ম্মে প্রতীক, গূঢ়ার্থসূচক অনুষ্ঠান বা ভাবব্যঞ্জক মূর্ত্তি শুধু যে সৌন্দর্য্যবোধকে উদ্‌বুদ্ধ ও সম্পুষ্ট করে তাহা নহে, কিন্তু এ সমস্ত হইল স্থূল উপায় যাহার সাহায্যে মানুষ তাহার হৃদয়ের আবেগ ও আস্পৃহাকে বাহ্যভাবে স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত সক্রিয় ও শক্তিশালী করিয়া তোলে। কেননা যদি একথা সত্য হয় যে আধ্যাত্মিক আস্পৃহা ব্যতীত পূজা অর্থশূন্য ও নিষ্ফল, তাহা হইলে ইহাও সত্য যে ক্রিয়া ও রূপ ব্যতীত আস্পৃহা হইয়া দাঁড়ায় এক অমূর্ত্তশক্তি যাহা জীবনের পক্ষে অপূর্ণরূপে কার্য্যকরী। অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে মানবজীবনের সকল ক্রিয়াকলাপের নিয়তিই হইতেছে একটা দানা বাঁধিয়া যাওয়া, কেবল বাহ্যরূপ মাত্রে পর্য্যবসিত হওয়া এবং ফলে সারহীন হইয়া পড়া ; এবং যদিও সেই লোকের জন্য সে সকল পদ্ধতি ও পূজার শক্তি রক্ষিত হয় যে তখনও তাহাদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তবু অধিকাংশ লোক পূজা-অর্চ্চনাকে যান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও প্রতীককে প্রাণশূন্য একটা চিহ্নমাত্র রূপে ব্যবহার করিতে থাকে আর তাহার ফলে ধর্ম্মের যথার্থভাব বিনষ্ট হয়, তাই অবশেষে তাহার রূপ ও পদ্ধতি হয় পরিবর্ত্তিত করিতে, না হয় একেবারে বর্জন করিতে হয়। এমন লোকও দেখা যায় যাহার কাছে সকল অনুষ্ঠান ও মূর্ত্তি এই কারণে অপ্রীতিকর ও পীড়াদায়ক হইয়া দাঁড়ায় ; কিন্তু বাহ্য প্রতীকের সাহায্য পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারে এরূপ লোক অতি বিরল ; তাছাড়া মানবপ্রকৃতির মধ্যে এমন একটা দিব্যভাব আছে যাহা আপনার পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তির জন্য সর্ব্বদাই ঐরূপ প্রতীককে চায়। প্রতীক সর্ব্বদাই বিধিসঙ্গত হইবে যদি তাহা হয় সত্য, অকপট, সুন্দর ও আনন্দময় ; এমন কি একথাও বলা চলে যে যাহার মধ্যে সুন্দরের উপলব্ধি ও ভাবের আবেগ নাই তেমন আধ্যাত্মিক চেতনা পূর্ণরূপে অথবা অন্ততঃপক্ষে সর্ব্বাঙ্গীণভাবে আধ্যাত্মিক হইতে পারে না। আধ্যাত্মিক জীবনে কর্ম্মের ভিত্তিরূপে থাকিবে নিরবচ্ছিন্ন এবং সঞ্জীবনী এক চিন্ময় চেতনা যাহা সর্ব্বদাই নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে অনুপ্রাণিত অথবা কোন রূপের মধ্যগত সত্যকে চিৎস্বরূপের প্রবাহদ্বারা নবভাবে উজ্জীবিত করিতে সর্ব্বদা সক্ষম, আর যাহার সৃজনী দৃষ্টি

ও আবেগের প্রকৃতিই হইবে এইভাবে আত্মপ্রকাশ করা এবং প্রত্যেক ক্রিয়াকে অন্তরাত্মার কোন সত্যের এক জীবন্ত প্রতীক করিয়া তোলা। আধ্যাত্মিকতার অন্বেষুকে এইভাবে জীবনকে গ্রহণ ও ব্যবহার করিতে হইবে, এইভাবে তাহার রূপকে পরিবর্ত্তিত এবং তাহাকে মূলতঃ গৌরবময় করিয়া তুলিতে হইবে।

পরম দিব্য প্রেম একটা সৃজনীশক্তি, যদিও সে শক্তি নীরব ও নিশ্চলভাবে নিজেতেই অবস্থিত থাকিতে পারে, তথাপি বাহ্যরূপ ও অভিব্যক্তি তাহারই আনন্দলীলা, অমূর্ত্ত ও অবাক্ দিব্যভাবে বদ্ধ থাকিতে সে বাধ্য নহে। ইহাও বলা হইয়াছে যে সৃষ্টি প্রেমেরই এক ক্রিয়া, অন্ততঃপক্ষে তাহা এমন এক ক্ষেত্র গড়িয়া তোলা যাহার মধ্যে দিব্য প্রেম আপন প্রতীকরাজি উদ্ভাবন করিয়া অন্যোন্যপরতা ও আত্মদানের কার্য্যে নিজেকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে ; আর যদি সৃষ্টির প্রাথমিক প্রকৃতি নাও হয় তথাপি ইহা নিশ্চয়ই চরম কাম্য ও লক্ষ্য হইতে পারে। এখন যে আমাদের সেরূপ মনে হয় না তাহার কারণ এই যে যদি বা দিব্যপ্রেমই জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রাণীর এই ক্রমা-ভিব্যক্তিকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তথাপি প্রাণের উপাদান ও কর্ম্ম গঠিত হইয়া উঠিয়াছে অহমিকার এক রূপায়ণ এক বিভাজন দ্বারা, আপাত উদাসীন এমন কি প্রতিকূল প্রাণহীন নিশ্চেতন জড়-জগতের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষা করিবার ও বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রাণশক্তি ও চেতনার এক সংগ্রামের মধ্য দিয়া। এই সংঘর্ষজনিত বিপর্য্যয় ও অন্ধকারের মধ্যে সকলেই পরস্পরের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, প্রত্যেকের মধ্যে সংকল্প রহিয়াছে যে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সে নিজের মধ্যে এবং তার পর শুধু গৌণভাবে অপরের মধ্যে নিজের সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং শুধু আংশিকভাবে পরার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে ; কেননা মানুষের পরার্থপরতাও মূলতঃ অহংগত আর ততদিন তাহা অহংগত থাকিতে বাধ্য যতদিন অন্তরাত্মা দিব্য একত্বের পরম রহস্যের সন্ধান না পাইতেছে। এই একত্বকে তাহার পরম উৎসের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া, অন্তর হইতে তাহাকে বাহিরে লইয়া আসা, সকল দিকে জীবনের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহাকে বিকীর্ণ করিয়া দেওয়া—ইহাই হইল যোগসাধনার কাম্য। সকল কর্ম্ম সকল বিসৃষ্টিকে পরিণত করিতে হইবে পূজায়, ভক্তির আত্মদানের এক সাক্ষাৎ-রূপে, এক প্রতীকে ; তাহার মধ্যে এমন কিছু থাকা চাই যাহা নিজের মধ্যে এক উৎসর্গের, দিব্য চেতনাকে গ্রহণ ও স্বীকারের বা প্রতিফলনের, পরম প্রেমাস্পদের সেবার, তাহার নিকট আত্মনিবেদনের ও আত্মসমর্পণের এক অভিজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইবে। কর্ম্মের বাহ্যরূপ ও মূর্ত্তির মধ্যে যেখানেই সম্ভব সেখানে ইহা করিতে হইবে, কিন্তু সর্ব্বদা ইহা করা চাই অন্তরের এরূপ ভাবাবেগ ও তীব্রতার

চায়, লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে তাহারা ঐ সব উর্দ্ধতন প্রভাবের শক্তি দীপ্তি ও আনন্দকে নিম্নতর জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করিতেছে। তাহার পরেও যখন সাধক বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত বা বিশ্বানুস্যূত দিব্য প্রেমের নিকট নিজেকে খুলিয়া ধরিতে সমর্থ হয়, তখনও সেই প্রেমধারাকে জীবনের মধ্যে ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিতে গেলেই সে দেখিতে পায় যে এই সমস্ত নিম্নতর প্রাকৃতশক্তি সে ধারাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিকৃত করিয়া দিবার জন্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। এই সমস্ত শক্তি সর্ব্বদাই প্রচ্ছন্ন গহ্বরের দিকে টানিয়া লইতে চায়, সেই উচ্চতর তীব্রতার মধ্যে নিজেদের খর্ব্বকারী উপাদানরাজি ঢালিয়া দেয়, যে শক্তি নামিয়া আসিতেছে নিজেদের এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইবার জন্য তাহাকে অধিকার করিতে এবং অধঃপাতিত করিয়া বাসনা ও অহমিকার জন্য অতিস্ফীত মন প্রাণ ও দেহের যন্ত্রে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। দিব্যপ্রেমকে সত্য ও জ্যোতির এক নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবীর স্রষ্টারূপে গ্রহণ না করিয়া পুরাতন এই পৃথিবীর কর্দ্দমকে স্বর্ণিম করিবার এবং ভাবোচ্ছ্বাসময় প্রাণিক কল্পনার এবং মনের আদর্শে গঠিত কল্পলোকের স্বপ্নরাজির পঙ্কিল অবাস্তব প্রাচীন আকাশকে শুধু গোলাপী ও নীলরঙে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিবার এক প্রচণ্ড সমর্থক ও গৌরবদায়ক উর্দ্ধায়িত শক্তিরূপে সে প্রেমকে এখানে বন্দী করিয়া রাখিতে চায়। এই মিথ্যার খেলাকে যদি চলিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উচ্চতর জ্যোতি শক্তি ও আনন্দ অপসৃত হয়, সাধক আবার নিম্নতর ভূমিতে নামিয়া পড়ে; নতুবা তত্ত্বোপলব্ধি অর্দ্ধপথে এক বিপদসঙ্কুল মিশ্রণে বাঁধা পড়িয়া থাকে অথবা যাহা খাঁটি আনন্দ নহে তেমন এক নিম্নতর উল্লাসের দ্বারা আবৃত এমন কি তাহার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়। এই কারণে যাহা সর্ব্ববিসৃষ্টির অন্তরে অনুস্যূত এবং যাহা সৃজনের ও উদ্ধারসাধনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি সেই দিব্য প্রেম পার্থিব জীবনে আজিও খুব অল্পই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে, অতি অল্প পরিমাণে সৃষ্টি করিতে বা মানুষকে তাহার অবর প্রকৃতির পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সকল দিব্যশক্তির মধ্যে প্রেমই প্রবলতম শুদ্ধতম দুর্লভতম ও তীব্রতম বলিয়াই মানবপ্রকৃতি বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই; মানুষ ইহার সামান্য যে অংশটুকু মাত্র ধরিতে পারিয়াছে তাহাও তৎক্ষণাৎ বিকৃত করিয়া পরিণত করিয়াছে প্রাণগত ধার্ম্মিকতার এক উৎকট আবেগে, ধর্ম্ম বা নীতির সমর্থনের অযোগ্য এক ভাববিলাসে, ইন্দ্রিয়সুখানুরাগী এমন কি কামভোগপরায়ণ মনের গোলাপী রং-এ রঞ্জিত আদিরসাত্মক এক রহস্যময় ভাবুকতায় অথবা মলিন ও পঙ্কিল এক উদ্দাম প্রাণতাড়নায়, এবং এই সমস্ত

হইতে হয়। ইহাদের দেওয়া বাধা অতি প্রবল ; কেননা তাহাদের অধিকার এত শক্তিশালী, আপাত দৃষ্টিতে এত দুর্জয় যে তাহা সেই অবজ্ঞাসূচক প্রবচনকে ঠিকই সমর্থন করে যাহা মানবপ্রকৃতিকে কুকুরের লাঙ্গুলের সহিত তুলনা করে ; কারণ ধর্ম্ম নীতি যুক্তি অথবা মুক্তিপ্রদ অন্য কোন প্রচেষ্টার দ্বারা যতই সোজা করা যাক না কেন তাহা আবার তাহার প্রকৃতিগত বক্রতায় ফিরিয়া যায়। আবার সেই অধিকতর বিক্ষুব্ধ প্রাণসংকল্পের তীব্রতা এত উৎকট, তাহার মুষ্টিবন্ধন এত দৃঢ়, তাহার কামক্রোধাদির আবেগ ও ভ্রমপ্রমাদ এমনই বিষম বিপদজনক, তাহার আক্রমণের প্রচণ্ডতা অথবা অক্লান্ত বাধাবিঘ্নের দুরাগ্রহের প্রাবল্য এত সূক্ষ্ম, অভিযান এত দুর্দ্দম্য, স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত এত সনির্ব্বন্ধ যে সাধুসন্ত এবং যোগী পুরুষেরাও তাহাদের জটিল চক্রান্ত ও দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে তাহাদের নিজেদের নির্ম্মুক্ত পবিত্রতা অথবা সাধনলব্ধ আত্ম-কর্ত্তৃত্ব রক্ষা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন না। সাধকের সংগ্রামরত সংকল্পের নিকট মনে হয় সে লাঙ্গুলের এই স্বাভাবিক বক্রতা দূর করিবার জন্য সকল চেষ্টাই বৃথা ; সংসার ছাড়িয়া পলায়ন, সুখময় স্বর্গলোকে প্রয়াণ অথবা শান্তিপূর্ণ বিলয়প্রাপ্তি—ইহাই জ্ঞানীর একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া সহজেই প্রশংসা পায়, আর যাহাতে পুনর্জন্ম না হয় তাহার একটা উপায় উদ্ভাবন, এই পার্থিব জীবনের অবসাদজনক দাসত্বের বা হেয় নিকৃষ্ট বুদ্ধি বিভ্রমের অথবা অন্ধ অনিশ্চিত সুখ ও সম্পদের একমাত্র প্রতিবিধান হইয়া দাঁড়ায়।

তথাপি একটা উপায় থাকা উচিত এবং আছেও বটে, প্রতিকারের একটা পন্থা ও বিক্ষুব্ধ প্রাণপ্রকৃতির রূপান্তরের একটা সম্ভাবনা নিশ্চয়ই রহিয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য জীবনের অন্তরতম প্রদেশে এবং তাহার নিজ তত্ত্বের মধ্যেই উন্মার্গগমনের কারণ খুঁজিয়া বাহির ও তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে, কেননা প্রতীয়মান বাস্তব দৃষ্টিতে যতই তমসাচ্ছন্ন ও বিকৃত বোধ হউক না কেন প্রাণও ভগবানের এক শক্তি, কোন দুষ্ট নিয়তি বা অন্ধ আসুরী প্রবেগ হইতে সৃষ্ট নহে। জীবনের মধ্যেই রহিয়াছে তাহার নিজের মুক্তির বীজ, তাই প্রাণবীর্য্যের মধ্য হইতেই আমাদিগকে উত্তরণের শক্তি ও শক্তিপ্রয়োগের যন্ত্র লাভ করিতে হইবে ; কেননা যদিও জ্ঞানের মধ্যে এক মুক্তিপ্রদ আলোক, প্রেমের মধ্যে এক পরিত্রাণ ও রূপান্তরের শক্তি আছে তবুও যতক্ষণ তাহারা প্রাণের স্বীকৃতি না পায় এবং যতক্ষণ ভ্রমশীল মানবীয় প্রাণশক্তিকে বিশোধিত ও উন্নীত করিবার কাজে তাহার কেন্দ্রস্থলে প্রযুক্ত কোন বীর্য্যকে ব্যবহার করিতে না পারে ততক্ষণ তাহারা এখানে ফলপ্রসূ হইতে পারে না। যজ্ঞকর্ম্মকে নানাভাবে বিভক্ত করিয়া সমস্যা-সমাধান সম্ভব নহে ; আমরা শুধু জ্ঞান ও প্রেমের

স্থানে বসাইতে হইবে এবং বাসনা ও অহমিকার অলীক আত্মাকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে জীবনকে পর্য্যন্ত নিগৃহীত করিতে, তাহার সার্থকতার স্বাভাবিক ধারাকে ব্যাহত করিতে হইবে ; কেননা এই বাহ্য কামময় আত্মার পশ্চাতে আমাদেরই মধ্যে এক ধ্রুব আন্তর প্রাণসত্তা আছে যাহার বিলোপসাধন করিতে হইবে না, বরং যাহাকে বাহিরে আনিয়া সুস্পষ্ট ও জ্বলন্ত করিয়া তুলিতে হইবে এবং দিব্য প্রকৃতির শক্তিরূপে তাহার নিজস্ব প্রকৃত কার্য্য করিবার জন্য তাহাকে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। এই খাঁটি প্রাণসত্তাকে আমাদের মধ্যস্থ প্রকৃত অন্তরতম আত্মার শাসনাধীনে সুস্পষ্ট-ভাবে সম্মুখভাগে না আনিলে প্রাণশক্তির উদ্দেশ্যাবলির দিব্য সিদ্ধি সম্ভব হইবে না। এই সমস্ত উদ্দেশ্য মূলতঃ একই থাকিবে কিন্তু তাহাদের আন্তর প্রণো-দনা ও বাহ্য প্রকৃতি রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। দিব্য প্রাণশক্তিও হইয়া উঠিবে বৃদ্ধি ও প্রসারের এক সংকল্প, আত্মপ্রতিষ্ঠার এক সামর্থ্য, কিন্তু সে প্রতিষ্ঠা হইবে আমাদের অন্তর্য্যামী দিব্য পুরুষের, বহিশ্চর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিত্বের নহে ; আর সে বৃদ্ধি ও পরিণতি হইবে খাঁটি দিব্য ব্যক্তিত্বে, কেন্দ্র-গত সত্তাতে, নিগূঢ় অবিনাশী পুরুষে যাহার উন্মেষ ও প্রকাশ অহমিকাকে অধীন ও পরিশেষে বিনষ্ট করিয়াই শুধু সম্ভব হইতে পারে। ইহাই জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য—সে উদ্দেশ্য বৃদ্ধি ও প্রসার বটে কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে আত্মাপুরুষের বৃদ্ধি বা অধিকতর অভিব্যক্তি, মন প্রাণ ও দেহে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ; উদ্দেশ্য, এক পাওয়া বটে কিন্তু তাহা দিব্য পুরুষের দ্বারা সর্ব্ববস্তুর মধ্যে অনুস্যূত দিব্যসত্তাকেই পাওয়া, অহংগত কামনার দ্বারা বস্তুকে বস্তুর নিজের জন্য পাওয়া নহে ; উদ্দেশ্য ভোগ বটে কিন্তু তাহা বিশ্বে দিব্য আনন্দেরই এক ভোগ ; উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বিজয় ও সাম্রাজ্যলাভও বটে কিন্তু তাহা হইবে অন্ধকারের শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করা, জ্ঞান প্রেম ও দিব্য সংকল্পের দ্বারা অজ্ঞানের রাজ্য অধিকার করিয়া পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতির উপর পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করা।

এই সমস্ত হইল প্রাণকর্ম্মরাজির দিব্যভাবে সম্পাদনের ও ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে তাহাদের রূপান্তর সাধনের বিধান, যাহা ত্রয়াত্মক যজ্ঞের তৃতীয় উপাদান, আর এই সমস্তই তাহাদের লক্ষ্য। যোগের উদ্দেশ্য প্রাণকে শুধু যুক্তি-বিচারশীল করিয়া তোলা নয় পরন্তু তাহার অতিমানসসিদ্ধি, তাহাকে শুধু নৈতিক ভূমিতে নয়, অধ্যাত্ম-ভূমিতে উন্নীত করা। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বাহ্য বিষয় ব্যবহার করা অথবা বহিরঙ্গ মনের প্রণোদনা অনুসরণ করা নয়

কিছুতে সমভাবাপন্ন : তাহার অন্তর্নিহিত সামর্থ্যকে কোন কর্ম্মের জন্য মুক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু সাক্ষীপুরুষে কোন প্রকার বাসনা দ্বারা কর্ম্ম গৃহীত বা আরব্ধ হইবে না ; সেখানে এমন এক সত্য ক্রিয়া করে যাহা নিজে ক্রিয়া বা তাহার দৃশ্যমান রূপরাজি ও প্রেরণাবলির অতীত এবং তদপেক্ষা বৃহত্তর, যাহা মন প্রাণশক্তি বা দেহেরও অতীত এবং তদপেক্ষা বৃহত্তর—যদিও অব্যবহিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাহা মনোময় প্রাণময় বা জড়ময় কোন রূপ গ্রহণ করিতে পারে। যখন কামনাবাসনার এইভাবে মৃত্যু হয় এবং চেতনার সর্ব্বত্র এই স্থির সমতা ও উদারতা পরিব্যাপ্ত হয়, কেবল তখনই আমাদের মধ্যস্থিত প্রকৃত প্রাণময় সত্তা আবরণ হইতে বাহিরে আসেন এবং আপন প্রশান্ত সুতীব্র শক্তিমান স্বরূপ প্রকাশ করেন। কেননা ইহাই প্রাণময় পুরুষের যথার্থ স্বভাব, জীবনের মধ্যে ইনি দিব্যপুরুষের এক অভিক্ষেপ ; শান্ত, সবল, জ্যোতির্ম্ময়, বহুবীর্য্যধারাযুক্ত, দিব্য ইচ্ছার অনুগত, অহমিকাশূন্য, তথাপি অথবা বরং তজ্জন্যই ইনি সকল কর্ম্ম, সকল মহৎ কৃত্য সাধন করিতে, উচ্চতম বা বৃহত্তম সকল দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ। যথার্থ প্রাণশক্তি তখন আত্মপ্রকাশ কবিবে, যাহা এই বিক্ষুব্ধ উৎপীড়িত বিভক্ত সদা ব্যতিব্যস্ত বাহ্য সামর্থ্য আর নহে বরং তাহা শান্তি বল ও আনন্দে পবিপূর্ণ মহান জ্যোতির্ম্ময় এক ভাগবত শক্তি, যাহা বিশাল প্রাণদেবতারূপে তাহার বহুদূরগামী বীর্যবন্ত পক্ষপুটে বিশ্বকে আবৃত ও আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে।

তথাপি বৃহৎশক্তি ও সমতার এই রূপান্তর পর্য্যাপ্ত নহে ; কেননা যদিও ইহার ফলে আমাদের সম্মুখে দিব্যজীবনের পথ খুলিয়া যাইতে পারে তবুও ইহা সে জীবনে নূতন কোন বিষয় প্রবর্ত্তনার অধিকার অথবা তাহার শাসনকার্য্য পরিচালনার শক্তি আমাদিগকে দিতে পারে না। এইখানে মুক্ত চৈত্যপুরুসের সান্নিধ্যের উপযোগিতা আসিয়া পড়ে ; ইহা অবশ্য আমাদিগকে চরম নির্দ্দেশ ও পরম শাসনক্ষমতা প্রদান করে না—কারণ তাহা দেওয়া তাহার কাজ নহে—কিন্তু অজ্ঞান হইতে দিব্যজ্ঞানে উত্তরণের পথে ইহা বাহ্য ও আন্তর জীবন ও কর্ম্মকে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে পরিচালনা করে ; ইহা প্রতিমুহূর্ত্তে দেখাইয়া দেয় সেই পথ ও প্রণালী এবং সেই সমস্ত সোপান যাহা আমাদিগকে এমন এক সার্থক আধ্যাত্মিক অবস্থায় লইয়া যায় যেখানে এক সক্রিয় পরম প্রেরণা দিব্যভাবাপন্ন প্রাণশক্তির ক্রিয়াবলিকে সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বর্ত্তমান আছে। ইহার জ্যোতির বিচ্ছুরণ প্রকৃতির অন্য সকল অংশকে আলোকিত করে, যে অংশগুলি তাহাদের নিজের বিশৃঙ্খল ও অনিশ্চিত শক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরিচালনা লাভ করে নাই বলিয়া অজ্ঞানের আবর্ত্তের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; ইহা মনে জাগা-

মধ্য হইতে অমৃত ও গরল এ উভয়ই প্রবলভাবে উঠিয়া আসিতে থাকে, আর এই ব্যবস্থা ততদিন চলিতে থাকে যতদিন সমস্ত প্রস্তুত না হয়, এবং যতদিন ক্রমবর্দ্ধনশীল দিব্য অবতরণ দেখিতে না পায় যে সত্তা ও প্রকৃতিতে তাহার পরিপূর্ণ শাসনের এবং সর্ব্বাবেষ্টনকারী সান্নিধ্যের উপযুক্ত অবস্থা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সত্তাতে সমতা চৈত্য আলোক ও সংকল্প যদি থাকে তাহা হইলে এই ক্রিয়াধারা যদিও পরিহার করা যায়না তথাপি তাহা অনেক পরিমাণে সহজ ও সুগম করিয়া তোলা যায়; তখন ইহার পথের নিকৃষ্টতম বাধাগুলি অপসারিত হইবে, রূপান্তরের পক্ষে সকল বাধাবিপত্তি ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া এক আন্তর প্রশান্তি আনন্দ ও ভরসা প্রতিপদক্ষেপে সহায়তা করিবে, আশ্রয় দিবে এবং ক্রমবর্দ্ধমান ভাগবতশক্তি প্রকৃতির পূর্ণ অনুমোদন পাইয়া বিরোধী-শক্তিরাজির সামর্থ্য শীঘ্র ক্ষয় ও সত্তা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। নিশ্চিত-ভাবে পরিচালনা ও রক্ষা করিবার এক শক্তি সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিবে, কখনও সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া কখনও বা আবরণের অন্তরালে থাকিয়া ক্রিয়া করিবে; চরম বিজয়ের শক্তি সাধনার প্রারম্ভে এবং সুদীর্ঘ মধ্যবর্ত্তী অবস্থার মধ্যেও বর্ত্তমান থাকিবে। কেননা সাধক দিব্য চালক ও রক্ষকের অথবা পরমা-মাতৃশক্তির ক্রিয়াধারা সর্ব্বদা অনুভব করিবে; সে জানিবে সব কিছুই পরম মঙ্গলের জন্য ঘটিতেছে, জানিবে তাহার অগ্রগতি সুনিশ্চিত, বিজয় অবশ্যম্ভাবী। যাহা হউক না কেন এই সাধনাধারা এক ও অপরিহার্য্য; ইহাতে বাহ্য বা আন্তর সমগ্র প্রকৃতি সমগ্র জীবন গৃহীত হইবে, ঊর্দ্ধ হইতে এক দিব্যতর জীবনের চাপে এ প্রণালীর মধ্যস্থিত শক্তিরাজি ও তাহাদের গতিবৃত্তিসকল প্রকাশ পাইবে এবং সাধক তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে এবং তাহাদের রূপান্তর সাধন করিতে পারিবে, অবশেষে সকল কিছু মহত্তর আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা অধিকৃত এবং এক দিব্য কর্ম্ম ও দিব্য উদ্দেশ্যের যন্ত্রে পরিণত হইবে।

এই প্রণালীতে ইহার প্রাথমিক বাহ্য এক স্তরেই ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে আমরা আমাদের নিজের সম্বন্ধে, আমাদের বর্ত্তমান চেতন সত্তার সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা শুধু এক প্রতিরূপস্থানীয় রূপায়ণ, এক বাহ্য ক্রিয়াধারা, এক বিরাট নিগূঢ় সত্তার সদা পরিবর্ত্তনশীল বাহ্য পরিণাম মাত্র। আমাদের পরিদৃশ্যমান জীবন এবং সেই জীবনের ক্রিয়াবলি সার্থক অভিব্যক্তির একটা পর্য্যায় বা ধারা ছাড়া আর কিছু নহে, কিন্তু যাহা সে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহা বাহিরের ক্ষেত্রে যাহা দেখা যায় তাহা নহে; আমাদের যথার্থ সত্তা আমাদের প্রতীয়মান বাহ্যরূপের অপেক্ষা অনেক বৃহৎ বস্তু, অথচ আমরা এই প্রতীয়মান রূপকেই

আসিতে পারে যখন আমরা যজ্ঞ বা আমাদের আত্মনিবেদনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হইতে এবং দিব্য অতিমানস বিজ্ঞানের শক্তি জ্যোতি ও পরমানন্দের সহিত তাহার ক্রিয়াধারা জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। কারণ কেবল তখনই এই যে সকল শক্তি বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং জীবনে ও তাহার কর্ম্মে নিজেদিগকে অপূর্ণরূপে প্রকাশ করিতেছে তাহারা তাহাদের মূল একত্ব সামঞ্জস্য ও অখণ্ড সত্যে, প্রকৃত নিরপেক্ষভাবে ও পরিপূর্ণ অর্থে উন্নীত হইবে। সেখানে জ্ঞান ও সংকল্প এক ও অভিন্ন, প্রেম ও শক্তি একই গতিবৃত্তিরূপে পরিণত; যে সকল দ্বন্দ্ব ও দ্বৈত এখানে আমাদিগকে প্রপীড়িত করে তাহারা তথায় সমন্বিত, একত্বে পর্য্যবসিত; সেখানে শুভ বা শিব পরিণত হইয়া পরম শিব হইয়া দাঁড়ায়, অশুভ বা অশিব ভ্রান্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া পশ্চাতে স্থিত শিবের মধ্যে ফিরিয়া যায়; এক দিব্য পবিত্রতা এবং এক অব্যর্থ সত্য-ক্রিয়ার মধ্য দিয়া পাপ ও পুণ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়; সন্দেহজনক ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সুখ এক দিব্য আনন্দের মধ্যে মিলাইয়া যায় যে আনন্দ শাশ্বত ধ্রুব নিত্যানন্দময় অধ্যাত্মস্বরূপের এক লীলা, পার্থিব দুঃখ মরিয়া আবিষ্কার করে এক আনন্দের সংস্পর্শকে যে আনন্দ তমসাচ্ছন্ন বিকৃতির জন্য এবং নিশ্চেতনার ইচ্ছাশক্তির তাহাকে গ্রহণ করিবার অসামর্থ্যের জন্য বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছিল। মনের পক্ষে এ সমস্ত বস্তু এক কল্পনা অথবা এক দুর্ব্বোধ্য রহস্য; কিন্তু চেতনা যেমন সীমিত মূর্ত্ত জড়-মন (**matter-mind**) হইতে মন বুদ্ধির অতীত প্রজ্ঞানভূমির উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রসারতার মধ্যস্থিত মুক্তি ও পূর্ণতার মধ্যে উঠিয়া যায় তেমনি এ সমস্ত স্পষ্ট ও অনুভূতির যোগ্য হইয়া উঠে; কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ সত্য ও স্বাভাবিক কেবল তখন হইতে পারিবে যখন অতিমানসই প্রকৃতির বিধান হইয়া দাঁড়াইবে।

তাহা হইলে জীবনের সার্থকতা ও সমর্থন, তাহার মুক্তি এবং দিব্যরূপ-প্রাপ্ত পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে ভাগবত জীবনে তাহার রূপান্তর নির্ভর করে এই উত্তরণ-সিদ্ধির উপর, এই সমস্ত উচ্চতম ভূমি হইতে পরিপূর্ণ সক্রিয় শক্তির পার্থিব চেতনার মধ্যে অবতরণের সম্ভাবনার উপর।

যাহা এই সমস্ত আধ্যাত্মিক উপায় অবলম্বন করিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হয় এবং প্রকৃতির এই পূর্ণাঙ্গ রূপান্তর সাধনের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায় এই ভাবে পরিকল্পিত বা ব্যবস্থিত সেই পূর্ণযোগের প্রকৃতিই আমাদের জীবনের

অথবা নৈতিক বোধও নয়—গ্রহণ-বর্জন করিবে চৈত্যপুরুষের নির্ব্বন্ধ, যোগের দিব্য দিশারীর আদেশ, ঊর্দ্ধতন আত্মাপুরুষের দিব্যদৃষ্টি, পরম প্রভুর জ্যোতির্ম্ময় পরিচালনা। আত্মার পথ মনোময় পথ নহে, মনোময় কোন বিধান বা মনোময় চেতনা সেখানে প্রেরক বা চালক হইতে পারে না।

সমভাবেই ইহা বলিতে হইবে যে আধ্যাত্মিক ও মনোময় কিম্বা আধ্যাত্মিক ও প্রাণময় অথবা এই উভয়বিধ চেতনার এক সংমিশ্রণ বা এক আপোস-রফা কিম্বা বাহিরের জীবন যেমন আছে সেইরূপই রাখিয়া শুধু আন্তর জীবনের বিশোধন ও উন্নয়নসাধন করাও পূর্ণযোগের বিধান বা লক্ষ্য হইতে পারে না। সমগ্র জীবনই গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু সমস্ত জীবনকে রূপান্তরিত করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে; সব কিছুকে অতিমানসপ্রকৃতির মধ্যস্থিত অধ্যাত্ম সত্তার অংশ রূপ বা যথাযোগ্য অভিব্যক্তিতে পরিণত করিতে হইবে। ইহাই হইল জড়জগতে আধ্যাত্মিক পরিণামের সর্ব্বোচ্চ শিখর ও শ্রেষ্ঠ গতি; যেমন প্রাণময় পশুর মনোময় মানবে পরিণতি জীবনকে মৌলিক চেতনার প্রসারে এবং তাৎপর্য্যে সম্পূর্ণ অন্য বস্তু করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি আমাদের এই জড়ভাবে বিভাবিত মনোময় সত্তার আধ্যাত্মিক ও অতিমানসসত্তাতে রূপান্তর—যাহা জড়ের শাসন হইতে মুক্ত হইবে কিন্তু জড়কে ব্যবহার করিবে এবং জীবনকে স্বীকার করিয়া চলিবে—বর্ত্তমানে অপূর্ণ সীমিত দোষত্রুটিভরা মানব-জীবনকে এমন কিছুতে পরিণত করিবে যাহা মূল চেতনাব প্রসারে ও তাৎপর্য্যে সম্পূর্ণ অন্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। জীবনের যে সমস্ত রূপ এই পরিবর্ত্তন গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারিবে না তাহাদিগকে লয় পাইতে হইবে আর যাহা কিছু তাহা গ্রহণ ও বহন করিতে সমর্থ হইবে তাহা বাঁচিয়া থাকিবে এবং চিৎস্বরূপের রাজ্যে প্রবেশ করিবে। ক্রিয়াশীল এক দিব্যশক্তি প্রতিমুহূর্ত্তে কি করিতে বা কি না করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিবে, সাময়িকভাবে বা স্থায়ীরূপে কি স্বীকার করিয়া লইতে অথবা কি বর্জন করিতে হইবে তাহা স্থির করিবে। কেননা যদি সেই শক্তির স্থানে আমাদের কামনা বা অহমিকাকে না বসাই—যাহাতে না বসাই সেজন্য আমাদের অন্তরাত্মাকে সর্ব্বদা জাগ্রত ও সতর্ক থাকিতে, সর্ব্বদা দিব্য পরিচালনাতে সজাগ থাকিতে হইবে এবং ভিতরের ও বাহিরেব যে অদিব্য ভাব আমাদিগকে উন্মার্গগামী করে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে—তাহা হইলে সেই শক্তি একাই আমাদিগকে সার্থকতায় লইয়া যাইবার পক্ষে সক্ষম ও সুপ্রচুর হইবে; আর তাহা কোন্ পথে এবং কি উপায়ে ইহা সাধিত করিবে তাহা এত বিশাল এত অন্তর্ম্মুখী এত জটিল যে মনের পক্ষে সেখানে আদেশ দেওয়া ও পরিচালনা করা তো দূরের কথা

সপ্তম অধ্যায়

ব্যবহারিক জীবনের আদর্শ ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা

জ্ঞানের যে ভিত্তির উপর কর্ম্মযোগীকে তাহার সকল কর্ম্ম ও সকলপরিণতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাহার অঙ্গসংস্থানের মধ্যপ্রস্তর বা প্রধান উপাদান হইল অভেদের একটা নিত্যবর্দ্ধমান বাস্তব অনুভূতি, একটি সর্ব্বব্যাপী একত্ব-বোধের জীবন্ত বোধ ; সকল সত্তা যে এক অবিভাজ্য সমগ্র বস্তু, ক্রমবর্দ্ধমান-ভাবে এই চেতনাতেই কর্ম্মযোগী বিচরণ করেন, তাহার সকল কর্ম্মও এই দিব্য অখণ্ড সমগ্রতার অঙ্গ বা অংশ। তাহার ব্যক্তিগত কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফল আর সমগ্রের মধ্যস্থিত একজন বিবিক্ত ব্যক্তির অহংগত "স্বাধীন" ইচ্ছা দ্বারা সর্ব্বথা বা প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত একটা পৃথক গতিবৃত্তিরূপে থাকিতে অথবা তদ্রূপ বোধ হইতে পারে না। আমাদের কর্ম্মাবলি এক অখণ্ড বিশ্বক্রিয়ার অঙ্গীভূত ; সেই সমগ্রতা হইতেই তাহারা উদ্ভূত হইয়াছে আবার তাহারই মধ্যে তাহারা যথা-স্থানে সন্নিবেশিত হইতেছে অথবা আরও যথার্থভাবে বলিতে গেলে তাহারা নিজেদিগকে সন্নিবিষ্ট করিতেছে, আর তাহাদের ফলাফল এমন সকল শক্তি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে যাহারা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে। যেমন তাহার বিরাট সমগ্রতায় তেমনি তাহার প্রত্যেক খণ্ড ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে এই বিশ্ব-ক্রিয়া সেই পরম একেরই এক অবিভাজ্য গতিবৃত্তি যিনি বিশ্বের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধ-মানভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। মানুষ যে অনুপাতে তাহার নিজের ও বাহিরে এই পরম একের মধ্যে এবং জাগতিক গতির অভ্যন্তরস্থিত তাঁহারই শক্তিরাজির নিগূঢ় অলৌকিক ও সার্থক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে জাগরিত হইতে থাকে সেই অনুপাতে সেও তাহার নিজের ও সর্ব্ববস্তুর সত্য সম্বন্ধে ক্রমশঃ অধিক সচেতন হইয়া উঠিতে থাকে। আমাদের এবং আমাদের চতু-র্দ্দিকে অবস্থিত অন্যসকলের মধ্যেও এই ক্রিয়া এই গতিধারা, আমাদের বহি-শ্চর চেতনা বিশ্বক্রিয়ারাজির যে ক্ষুদ্র খণ্ড সম্বন্ধে শুধু সচেতন আছে কেবল তাহাতে নিবদ্ধ নহে ; ইহার ভিত্তিরূপে যাহা আমাদের মনের নিকট অধিচেতন বা অবচেতন সেইরূপ এক বিশাল পরিবেষ্টনকারী সত্তা ইহাকে ধারণ করিয়া

এই অপ্রাচুর্য্য হ্রাস পাইতে থাকে বটে কিন্তু মূল বস্তুর আরও কাছে আসিলেও তাহা কখনই তাহার সত্যে এমন কি তাহার প্রকৃত এক আংশিক মূর্ত্তিতে পরিণত হইতে পারে না। শুধু অখণ্ড বিশ্বের মধ্যে নয়, শুধু জীবন্ত ভাবনাশীল প্রাণীর সমষ্টিতেও নয়—কিন্তু প্রত্যেক ব্যষ্টিব্যক্তির অন্তরাত্মায় দিব্য পরম রহস্যের এবং অনন্তের নিগূঢ় সত্যের কিছু বর্দ্ধমানভাবে প্রকট করিবার জন্য ভাগবত সংকল্প যুগযুগান্ত ধরিয়া ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে। তাই সমগ্র বিশ্বের অন্তরে, ভূত সমষ্টির মধ্যে, প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তার ভিতরে একটা বদ্ধমূল সহজ প্রতীতি বা বিশ্বাস আছে যে তাহা নিজে পূর্ণ হইয়া উঠিতে পাবে, বা উঠিবে, আর আছে ক্রমবর্দ্ধমান পূর্ণতর ও সুসমঞ্জসতর আত্ম-পরিণতির মধ্য দিয়া বস্তুর নিগূঢ় সত্যের অধিকতর নিকটে পৌঁছিবার এক অবিরাম প্রচেষ্টা ও গতি। এই প্রচেষ্টাই মানুষের গঠনশীল মনের কাছে জ্ঞান, অনুভূতি, চরিত্র, রসবোধ ও ক্রিয়ারূপে দেখা দেয়, দেখা দেয় সেই সমস্ত মান ও বিধান, নিয়ম ও আদর্শরূপে যাহাদিগকে বিশ্বধর্ম্মে রূপান্তরিত করিতে মানুষ প্রযত্নশীল হয়।

যদি আমরা আমাদের অধ্যাত্ম সত্তাতে স্বাধীন হইতে চাই, যদি আমরা একমাত্র আমাদের পরম সত্য ছাড়া আর কিছুর অধীন হইতে না চাই, তাহা হইলে এ ধারণা আমাদিগকে পরিহার করিতে হইবে যে আমাদের মানসিক ও নৈতিক বিধিবিধান দ্বারা অনন্তকে বন্ধন করা যায় অথবা আমাদের আজিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের মধ্যে পরম পবিত্র চরম শাশ্বত কোন বস্তু আছে। যতদিন প্রয়োজন আছে ততদিন উচচ হইতে উচচতর সাময়িক আদর্শ গঠিত করিলে জাগতিক প্রগতির মধ্যে ভগবানকেই সেবা করা হইবে ; কিন্তু কোন বিধান বা আদর্শকে চরম বা অমোঘ বলিয়া চিরকালের জন্য অচলপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিলে তাঁহার চিরন্তন প্রবাহকে বাঁধ দিয়া আটক করিবার চেষ্টাই করা হইবে। একবার এই সত্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিলে প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ মানবাত্মা শিব ও অশিবের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইবে। কেননা যাহা কিছু ব্যক্তিকে বা জগৎকে তাহাদের দিব্য পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে সহায়তা করে তাহাই শিব বা শুভ, আর যাহা কিছু সেই প্রগতিকে রুদ্ধ বা ব্যাহত করে তাহাই অশিব বা অশুভ। কিন্তু এই পূর্ণতা নিত্যবৃদ্ধিশীল, কালের ক্ষেত্রে তাহার ক্রম-

তৃতীয়ে সর্ব্বোত্তম নৈতিক উৎকর্ষসাধন ; পরিশেষে প্রকৃতির সর্ব্বোচ্চ দিব্য বিধানের উপলব্ধি।

মানুষ তাহার দীর্ঘ ক্রমবিকাশের পথে যাত্রারম্ভের সময় এই চারিটির কেবল প্রথম দুইটি দ্বারাই আলোকিত ও পরিচালিত হয় ; কেননা এই দুইটিই তাহার জান্তব ও প্রাণময় সত্তার বিধান, আর দেহপ্রাণময় পশু-মানবরূপেই সে প্রগতির পথে প্রথমে অগ্রসর হয়। পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত কার্য্য হইল মানবতার জাতিরূপের মধ্যে দিব্য পুরুষের বর্দ্ধমান এক প্রতিরূপ ফুটাইয়া তোলা, তাহার আন্তর ও বাহ্য প্রণালীর পুরু আবরণের পশ্চাতে থাকিয়া জ্ঞাত কি অজ্ঞাতসারে প্রকৃতি তাহার কর্ম্মের মধ্য দিয়া এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু জড় বা পশুভাবাপন্ন মানুষ তাহার জীবনের এই আন্তর লক্ষ্যের সম্বন্ধে অজ্ঞ ; সে জানে শুধু তাহার নিজের অভাব ও আকাঙ্ক্ষাকে, তাই তাহার নিকট কি চাওয়া হয় অথবা তাহাকে কি করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তাহার নিজের অভাবের বোধ এবং তাহার নিজের কামনার চাঞ্চল্য ও নির্দ্দেশ ছাড়া অন্য পরিচালকের সাক্ষাৎ অবশ্যম্ভাবীরূপে সে পায় না। সর্ব্বাগ্রে তাহার দেহ ও প্রাণের দাবি ও প্রয়োজন মিটানো এবং তাহার পর হৃদয়ের যে আবেগ অথবা মনের যে আকৃতি যে কল্পনা বা সক্রিয় ধারণা তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে তাহাদের পরিতৃপ্তি সাধনই হইল প্রথম অবস্থায় তাহার আচরণের স্বাভাবিক বিধান। সাম্যবিধায়ক বা অভিভবকারী একমাত্র যে বস্তু এই নির্ব্বন্ধাতিশয়যুক্ত স্বাভাবিক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বা তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে তাহা হইল যে পরিবার সম্প্রদায় জাতি বা দলের সে অন্তর্ভুক্ত তাহার কল্পনা বা ধারণা তাহার প্রয়োজন ও বাসনা তাহার কাছে যে দাবি উপস্থিত করে তাহার তাড়না।

আবার দ্বিতীয় আদর্শের বিধানকে কার্য্যকরী করিবার আদৌ কোন প্রয়োজন হইত না যদি মানুষ একলা তাহার নিজের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিতে পারিত—আর তাহা শুধু সম্ভব হইত যদি জগতে ব্যক্তিগত উন্নতি ও পরিণতি সাধনই ভগবানের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত। কিন্তু সমগ্র ও তাহার অংশরাজির মধ্যে পরস্পর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়াই সর্ব্বসত্তাকে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে হয়, সমগ্রের যেমন প্রয়োজন তাহার প্রতি অঙ্গকে তেমনি প্রতি অঙ্গেরও প্রয়োজন সমগ্রকে, তাই সংঘ এবং তন্মধ্যস্থ সকল ব্যষ্টিব্যক্তি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় দর্শনের ভাষায় পৃথক পৃথক ব্যষ্টি সত্তা এবং সংঘগত সত্তা, ব্যষ্টি ও সমষ্টি এ উভয় রূপের মধ্য দিয়াই ভগবান সর্ব্বদা আত্মপ্রকাশ করেন। যে মানুষ তাহার বিবিক্ত সত্তার পরিণতি, তাহার পূর্ণতা

করিবে নিজের অন্তরাত্মাদ্বারা যাহা পূর্ব্বতন সকল রূপের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার আলোক দ্বারা সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অধিকার ও রূপান্তরিত করিবে।

সমাজের দাবির সঙ্গে ব্যক্তির দাবির সংঘর্ষের ক্ষেত্রে দুইটি আদর্শ এবং দুইটি চরম সমাধান পরস্পরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। একটি হইল সমষ্টির দাবি, যে চায় ব্যষ্টি অল্পবিস্তর পূর্ণরূপে তাহার অধীন হইয়া চলুক, অথবা এমন কি সমাজের মধ্যে নিজের স্বাধীন সত্তা ডুবাইয়া দিক—ক্ষুদ্রতর বৃহত্তরের নিকট নিজেকে বলিদান বা উৎসর্গ করুক। এ আদর্শ অনুসারে ব্যষ্টিকে সমাজের অভাব ও প্রয়োজন নিজেরই অভাব ও প্রয়োজন, সমষ্টির বাসনা নিজের বাসনা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে; নিজের জন্য নয়, যে গোষ্ঠি কুল সম্প্রদায় বা জাতির সে অন্তর্ভুক্ত তাহার জন্যই তাহাকে বাঁচিতে হইবে। অপরপক্ষে ব্যষ্টির দিক হইতে আদর্শ ও চরম সমাধান এই যে সমাজ তাহার নিজের জন্য অথবা অন্যসকল কিছুকে বাদ দিয়া নিজের সমষ্টিগত উদ্দেশ্যের জন্য যে বর্ত্তমান থাকিবে তাহা নহে কিন্তু থাকিবে ব্যষ্টি ও তাহার পূর্ণতাসিদ্ধির জন্য, তাহার মধ্যস্থিত ব্যক্তিবর্গেব বৃহত্তর ও পূর্ণতর জীবন-প্রতিষ্ঠার জন্য। ব্যষ্টির সর্ব্বোত্তম সত্তার যথাসম্ভব প্রতিভূ হইয়া এবং তাহার আত্মোপলব্ধির সহায়তা করিয়া সমাজ তাহার সদস্যের প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করিবে, নিজের অভ্যন্তরস্থিত ব্যষ্টিব্যক্তিবর্গের স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুমোদন ও স্বীকৃতিতেই তাহার অস্তিত্ব রক্ষিত হইবে, তজ্জন্য তাহাকে আইন কানুন বা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ কবিতে হইবে না। এই দুই আদর্শের কোনটিব যথার্থ অনুগামী সমাজ জগতে কোথাও নাই, এরূপ একটি সমাজসৃষ্টি অতি কঠিন, কোনপ্রকারে সৃষ্ট হইলেও যতদিন ব্যষ্টি ব্যক্তি তাহার জীবনের প্রধান প্রযোজকশক্তিরূপে অহমিকাতে সংসক্ত থাকিবে ততদিন তাহার অনিশ্চিত অস্তিত্ব রক্ষা করা হইবে দুরূহতম ব্যাপার। সমাজের দ্বারা ব্যষ্টিব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নয় সাধারণভাবে শাসন ও পরিচালনই সহজতর উপায় এবং প্রথম হইতেই প্রকৃতি সহজাত সংস্কার বশে সেই পন্থাই গ্রহণ করিয়াছে আর কঠোর বিধিবিধান ও অবশ্য পালনীয় লোকাচারের সহায়তা লইয়া এবং আজিও যে মানুষ পরতন্ত্র ও অপরিণতবুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে সতর্কভাবে তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া এই সাম্য বজায় রাখিয়াছে।

আদিম কালের সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত জীবনকে সম্প্রদায়গত দৃঢ় ও অচল-

মনোময় ও নৈতিক প্রকৃতির পরিণতির দ্বারা একটা স্থির আন্তর আদর্শ বা মানের দিকে অগ্রসর হয় অথবা ইহাও বলা চলে যে তাহার চলিবার পথের লক্ষ্য ন্যায়-পরতা, ধর্ম্মনিষ্ঠতা, প্রেম, যথাযথযুক্তি, যথার্থ শক্তি, সৌন্দর্য্য, আলোক প্রভৃতি পরমগুণের এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত আদর্শে পৌঁছা। সুতরাং মূলতঃ ইহা ব্যক্তিসত্তারই এক আদর্শ, সমষ্টিগত মনের সৃষ্টি নয়। ব্যষ্টিব্যক্তিই চিন্তাশীল ভাবুক, ব্যষ্টি-ব্যক্তিই এ আদর্শকে প্রকট ও রূপায়িত করিয়াছে, নৈলে ইহা অমূর্ত্ত অবস্থায় সমষ্টিমানবের অবচেতনার মধ্যে থাকিয়া যাইত। ব্যষ্টিব্যক্তি নৈতিকতার সাধকও বটে; যে আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সাধিত হয় তাহা বাহ্য বিধি-বিধানের অধীনতা স্বীকারের ফলে নয়, আন্তর আলোকের নির্দ্দেশেব বলেই হয়, মূলতঃ তাহা এক ব্যক্তিগত প্রযাস। তাহার ব্যক্তিগত আদর্শকে একটা চরম নৈতিক আদর্শের অনুবাদ বলিয়া খ্যাপন করিয়া চিন্তাশীল মনীষী তাহা যে শুধু নিজের উপর আরোপ করে তাহা নহে কিন্তু তাহার ভাবনা যাহাদের মধ্যে পৌঁছে ও অনুপ্রবিষ্ট হয় সেই সকল ব্যক্তিসত্তার উপরও আরোপিত করে। সাধারণ ব্যষ্টিব্যক্তিগণ যেমন তাহার সেই ধারণা অধিক হইতে অধিকতররূপে গ্রহণ করিতে থাকে তেমনি—তাহা কার্য্যে অপূর্ণভাবে প্রয়োগ করুক অথবা একেবারেই প্রয়োগ না করুক—সমাজও এই নূতন নির্দ্দেশ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। তখন সমাজ ধারণায় এ প্রভাব গ্রহণ করে এবং এই সকল উচ্চতব আদর্শের সংস্পর্শে আগত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নূতনরূপে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে, যদিও বিস্ময়কব কোন সফলতা সে যে লাভ কবে তাহা নহে। কিন্তু সমাজেব সহজাত প্রবৃত্তিই এই যে এ সমস্তকে অমোঘ বিধান, বাঁধাধরা আকাব, যান্ত্রিক প্রথা, অবশ্যপালনীয় বাহ্য নির্দ্দেশরূপে সে নিজেব মধ্যস্থিত সজীব ব্যক্তিবর্গের উপর সর্ব্বদা চাপাইয়া দেয়।

কারণ, ব্যষ্টিব্যক্তি যখন কতকটা স্বতন্ত্র হইয়াছে, যখন সে নিজে সচেতনভাবে উন্নতি ও পুষ্টিলাভে সমর্থ নৈতিক সত্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যখন সে আন্তর জীবন সম্বন্ধে সজাগ এবং আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য উৎসুক হইয়াছে, তাহার পরেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমাজ থাকে তাহার রীতিপদ্ধতিতে বহির্ম্মুখী, তাহার জীবনধারায় অর্থনীতি দ্বারা পরিচালিত জড়ভাবাপন্ন ও যান্ত্রিক, তখন বুদ্ধি ও আত্মোৎকর্ষের উপর ততটা ঝোঁক নাই যতটা আছে স্থিতিশীলতা ও আত্ম-রক্ষার উপর। আজ চিন্তা ও প্রগতিশীল ব্যষ্টিমানব সহজাত প্রবৃত্তিচালিত স্থিতিশীল সমাজের উপর যে বৃহত্তম বিজয় লাভে সমর্থ হইয়াছে তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে তাহার ভাবনা ও সংকল্পের দ্বারা অর্জিত সেই শক্তি যাহা সমাজকেও চিন্তা করিতে বাধ্য করিয়াছে, বাধ্য করিয়াছে সমবেত জীবনের ন্যায়পরতা ও

গ্রস্ত সোপানাবলি মাত্র, যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া পাশব জীবনের স্বাভাবিক বিধান হইতে মুক্ত হইয়া অধিকতর উন্নত আলোকে বা সর্ব্বজনীন বিধানে প্রবেশ করিতে সাধক চেষ্টা করে। নিজের গোপন পূর্ণতার দিকে অভিযাত্রী চিৎপুরুষই আমাদের অন্তরাত্মা বলিয়া সেই দিব্য আদর্শ হইবে আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতির চরম আধ্যাত্মিক বিধান ও সত্য। আবার আমরা একদিকে জগতে সকলের সহিত সাধারণ সত্তা ও প্রকৃতিবিশিষ্ট দেহধারী সত্তা, অন্যদিকে জগদতীত পরমতত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতে সমর্থ ব্যষ্টি আত্মা বলিয়া আমাদের এই পরম সত্যের এক দ্বৈত প্রকৃতি আছে। ইহা অবশ্য এমন এক বিধান ও সত্য যাহা আধ্যাত্মিক ভাবে বিভাবিত সমবেত জীবনের নিখুঁত গতি-বৃত্তি, সামঞ্জস্য ও ছন্দ আবিষ্কার করে এবং প্রকৃতির বহুবিচিত্র একত্বের মধ্যে প্রতি সত্তা ও সর্ব্বসত্তার সহিত আমাদের সম্বন্ধ পূর্ণভাবে নির্ণয় করে। আবার সেই একই সময়ে ইহা অবশ্যই এমন এক বিধান ও সত্য যাহা ব্যষ্টিব্যক্তির * আত্মা মন প্রাণ ও দেহের মধ্যে ভগবানের সাক্ষাৎ প্রকাশের ছন্দ ও যথাযথ সোপানাবলি আমাদের নিকট প্রতিমুহূর্ত্তে ব্যক্ত করিয়া দেয়। আর আমরা অনুভূতিতে দেখিতে পাই যে ক্রিয়ার এই পরম আলোক ও শক্তি তাহার উচ্চতম প্রকাশে একই সঙ্গে একদিকে একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান ও অন্যদিকে এক চরম স্বাধীনতার অভিব্যক্তি; অলঙ্ঘনীয় বিধান কেননা ইহা এক অবিক্রিয় সত্য দ্বারা আমাদের অন্তর ও বাহিরের প্রতি গতিবৃত্তিকে শাসিত করিতেছে; আবার তথাপি প্রতিমুহূর্ত্তে এবং প্রতিগতিবৃত্তিতে পরম পুরুষের অবাধ স্বাধীনতা আমাদের সচেতন ও মুক্ত প্রকৃতির পরিপূর্ণ নমনীয়তাকে স্বচ্ছন্দে পরিচালনা করিতেছে।

আদর্শ নীতিবাদী তাহার নিজের নৈতিক তথ্যাবলির মধ্যে, যাহা মনোময় ও নৈতিক সূত্রাবলির অন্তর্গত তেমন অধস্তন শক্তি ও উপাদানের মধ্যে এই পরম বিধান আবিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করে। আর তাহাদিগকে পোষিত ও সুব্যবস্থিত করিবার জন্য সে আচরণে এমন এক মৌলিক তত্ত্ব বাছিয়া নেয়, যাহা মূলতঃ অপূর্ণাঙ্গ ও ভ্রমসঙ্কুল, বুদ্ধি, উপযোগিতা, সুখবাদ, যুক্তিবিচার, বোধিভাবিত বিবেক অথবা অন্য কোন সাধারণ আদর্শ দ্বারা গঠিত। এ প্রকার সকল চেষ্টার নিষ্ফলতা নিয়তিনির্দ্দিষ্ট। আমাদের আন্তর প্রকৃতি শাশ্বত পুরুষেরই ক্রমাভিব্যক্তি আর তাহা এরূপ জটিল ও বহুমুখী যে তাহাকে একমাত্র

* এইজন্য গীতা ধর্ম্ম শব্দে সাধারণ ধার্ম্মিকতা ও নীতিবাদের অধিক কিছু বুঝিয়াছে; ধর্ম্ম হইল আমাদের আত্মসত্তার স্বরূপভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম।

এক মহাশক্তির ক্রিয়াধারা এবং মন প্রাণ ও দেহের রূপান্তরে সক্ষম শাশ্বত এক সত্যের প্রতিলিপি বলিয়া অনুভব করিতে হইবে। আর এইরূপে ইহা সত্য, অমোঘবীর্য্য ও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া অতিমানসচেতনা এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সর্ব্বজনীনভাবে প্রয়োগই হইল সেই একমাত্র শক্তি যাহা পৃথিবীর উচচতম প্রাণীগণের মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে পূর্ণতা আনয়ন করিতে পারে। যখন আমরা দিব্যচেতনা ও পরমসত্যের সংস্পর্শে সর্ব্বদা আসিতে সমর্থ হইব কেবল তখনই চিন্ময় ভগবান বা সক্রিয় ব্রহ্মের কোন রূপ আমাদের পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করিয়া তাহার সংঘর্ষ পদস্খলন দুঃখতাপ ও অসত্যসকলকে পরম জ্যোতি শক্তি ও আনন্দের মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিবে।

পরমের সহিত মানবাত্মার নিরন্তব সংস্পর্শের পরাকাষ্ঠা হইল সেই আত্মদান যাহাকে আমরা দিব্যসংকল্পের নিকট আত্মসমর্পণ এবং যিনি সর্ব্ব সেই পরম একের মধ্যে বিবিক্ত অহমিকার নিমজ্জন বলি। মানবাত্মার এক বিশাল সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব এবং সর্ব্বভূতের সহিত অখণ্ড একত্বই অতিমানস চেতনা ও আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি ও দৃঢ় বিধান। কেবলমাত্র সেই সর্ব্বময় ভাব ও একত্বের মধ্যে আমরা দেহধারী জীবের জীবনে দিব্য অভিব্যক্তির পরমবিধান খুঁজিয়া পাইতে পারি; কেবলমাত্র তাহারই মধ্যে আমাদের ব্যষ্টিপ্রকৃতির পরম গতি ও যথার্থ খেলা আবিষ্কার করিতে পারি। আবার কেবল তাহারই মধ্যে এই সমস্ত অধস্তন বিবাদ ও বিরোধ, অভিব্যক্ত সকল জীবনের খাঁটি সম্বন্ধের সর্ব্ব-জয়ী সুসঙ্গতিতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে, যে জীব অদ্বয় পরমেশ্বরেরই অংশ ও অদ্বিতীয়া বিশ্বজননীর সন্তান।

আমাদের সকল আচরণ ও ক্রিয়া এক শক্তির গতিবিধির অঙ্গীভূত, যে শক্তি তাহার উৎপত্তিস্থানে গোপন সংকল্পে ও মর্ম্মে অনন্ত ও দিব্য, যদিও যে রূপে আমরা তাহাকে দেখি, বোধ হয় তাহা নিশ্চেতন বা অজ্ঞান, জড় প্রাণ ও মনো-ময় এবং সসীম; অথচ ইহাই ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত প্রকৃতির অন্ধকারের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে দিব্য ও অনন্তের কিছুটা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ক্রিয়াশীল হইয়াছে। এই শক্তিই মানুষকে পরম জ্যোতির দিকে লইয়া চলিয়াছে যদিও এখনও অজ্ঞানান্ধকারের মধ্য দিয়া। ইহা মানুষকে প্রথমে তাহার অভাব আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া পরিচালিত করে, তাহার পর মনোময় ও নৈতিক আদর্শের আলোকে কতকটা রূপান্তরিত ও দীপ্ত উদারতর অভাব ও আকাঙ্ক্ষার

মানবজাতির বর্ত্তমান বাস্তব অবস্থায় ব্যক্তিকেই অগ্রদূত ও পথপ্রদর্শক হইয়া এই উচচ ভূমিতে উন্নীত হইতে হইবে। তাহার বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই তাহার কর্ম্মাবলিকে এরূপভাবে নির্দ্ধারিত ও রূপায়িত করিবে যাহাতে তাহারা সচেতনভাবে দিব্য সমষ্টিগত ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের হইবে। তাহার আন্তর অবস্থা, তাহার কর্ম্মের মূল উৎস একই থাকিবে ; কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত কর্ম্মগুলি অজ্ঞানমুক্ত জগতের ক্রিয়াধারা যেরূপ হইবে তাহা হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন হইতে পারে। তথাপি তাহার চেতনা ও তাহার আচার ব্যবহারের দিব্যযন্ত্র—এরূপ মুক্ত বস্তু সম্বন্ধে 'যন্ত্র' শব্দটি যদি ব্যবহার করা যায়—হইয়া উঠিবে পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে সেইরূপ, অর্থাৎ যাহাকে আমরা পাপ বলি সেই প্রাণজ অশুচিতা, কামনা-বাসনা ও অবৈধ আবেগ বা উত্তেজনার অধীনতা হইতে তাহারা হইবে মুক্ত ; আর তাহারা আবদ্ধ হইবে না যাহাদিগকে আমরা পুণ্য বলি সেই নৈতিক সূত্রাবলি প্রণোদিত শাসনের দ্বারা ; তাহারা হইবে মানসচেতনা হইতে বৃহত্তর এক চেতনার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে নিশ্চিত শুদ্ধ ও পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাদের প্রতিপদক্ষেপে চিৎপুরুষের জ্যোতি ও সত্যের দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত। যাহারা অতিমানস পূর্ণতায় পৌঁছিয়াছে তাহাদিগকে লইয়া যদি একটা সমাজ বা সংঘ গঠিত করা যায়, বস্তুতঃ তাহা হইলেই কিছু দিব্য সৃষ্টি রূপপরিগ্রহ করিতে, এক নূতন জগৎ নামিয়া আসিতে পারে, যাহা হইয়া দাঁড়াইবে এক নবীন স্বর্গ ; তখন এখানে এই জগতে অপস্রিয়মান এই পার্থিব অজ্ঞানের অন্ধকারের মধ্যে অতিমানসজ্যোতি প্রদীপ্ত এক অভিনব জগৎ সৃষ্টি সম্ভব হইবে।

মন নীরব হইয়া গিয়াছে এবং শুধু দিব্য জ্ঞানের আলোক ও সত্যের এক প্রণালীতে পরিণত হইয়াছে। তাহার চিদাত্মার বিশালতার পক্ষে মনোময় আদর্শ অতি সংকীর্ণ বস্তু; এ সময় অনন্তের মহাসমুদ্রই তাহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহাকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে।

সরল ও অকপটভাবে যে কেহ কর্ম্মমার্গে প্রবেশ করিতে চায় তাহাকে, যাহাতে অভাব ও আকাঙ্ক্ষাই আমাদের কর্ম্মের প্রধান বিধান সেই স্তর পশ্চাতে ফেলিয়া আসিতেই হইবে। কেননা যদি সে যোগের উচচ লক্ষ্যকে স্বীকার করিয়া লয় তাহা হইলে যে সকল বাসনা তাহার সত্তাকে তখনও বিক্ষুব্ধ করিতেছে তাহাদিগকে নিজের নিকট হইতে লইয়া অন্তর্য্যামী ভগবানের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। তাঁহারই পরমশক্তি তাহাদের সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা করিবে যাহাতে যেমন সাধকের তেমনি সর্ব্বভূতের মঙ্গল সাধিত হইবে। সাধকের প্রত্যাখ্যান বা বর্জন যদি অকপট হয় তাহা হইলে আমরা বস্তুতঃ দেখিতে পাইব যে একবার এই আত্মসমর্পণ করিবার পরেও কিছু কালের জন্য অহংগত বাসনার পরিতর্পণ স্বভাবের পূর্ব্বেকার আবেগের বশে পুনরাবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইবে শুধু সঞ্চিত গতিবেগ ক্রমশঃ ক্ষয় করিয়া দেওয়ার জন্য, আর দেহধারী সত্তার যে অঙ্গকে শিক্ষা দেওয়া অতি দুরূহ তাহার সেই স্নায়ুগত প্রাণগত ও ভাবাবেগময় প্রকৃতিকে বাসনার প্রতিক্রিয়াদ্বারা শিক্ষা দেওয়ার জন্য; কেননা এই প্রতিক্রিয়া জাত জ্বালাযন্ত্রণা ও চঞ্চলতার সহিত সাধক-জীবনের উচচতর শান্তি বা দিব্য আনন্দের অপরূপ প্রকাশের প্রশান্ত সময়ের তুলনায় তিক্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা সে শিক্ষা করে যে, যে-সাধক মুক্তিকামী অথবা নিজের মূল ভাগবত প্রকৃতি লাভে অভীপ্সু তাহার পক্ষে অহংগত বাসনা তাহার আত্মার বিধান নয়। পরে এই সমস্ত আবেগের মধ্যস্থিত বাসনাময় উপাদান বাহিরে নিক্ষিপ্ত অথবা অবিরাম অস্বীকৃতি এবং রূপান্তরসাধন-প্রয়াসের চাপে স্থায়ীভাবে বিতাড়িত হইবে। যাহা সকল কর্ম্ম ও সকল কর্ম্ম ফলের মধ্যে এক সমান আনন্দ দ্বারা সমর্থিত, যাহা উর্দ্ধ্ব হইতে অনুপ্রাণিত বা আরোপিত, তাহাদের মধ্যস্থিত কর্ম্মের তেমন এক শুদ্ধ প্রকৃতি শুধু চরম পূর্ণতার সুসঙ্গতির মধ্যে রক্ষিত হইবে। স্নায়বিক সত্তার স্বাভাবিক বিধান ও অধিকার হইল কর্ম্ম করা ভোগ করা, কিন্তু ব্যক্তিগত বাসনার বশে কর্ম্ম ও ভোগের নির্ব্বাচন শুধু তাহার অবিদ্যাচ্ছন্ন

দিকে নিবদ্ধ রাখিয়া এ সমস্ত তাঁহারই চরণে ছাড়িয়া দিবে যাঁহাকে সকল আদর্শ অপূর্ণভাবে ও আংশিকরূপে ব্যক্ত করিতে চাহিতেছে ; মানুষের নৈতিক গুণাবলি তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত অসীম পূর্ণতার হাস্যোদ্দীপক এক বিকৃতিমাত্র, তাহাদের না আছে সমৃদ্ধি, না আছে নমনীয়তা। আমাদের স্নায়ুগত কামনা বাসনার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই পাপ ও অশিবের দাসত্ব হইতে আমাদের মুক্তি ঘটে ; কেননা তাহা রজোগুণ সমুদ্ভূত অর্থাৎ প্রাণগত প্রণোদনা ও আবেগ অথবা আসক্তির তাড়না হইতে জাত ; রজোগুণের রূপান্তর-প্রাপ্তির সহিত তাহা তিরোহিত হয়। কিন্তু সাধকের পক্ষে আচার বা অভ্যাসগত অথবা মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিম্বা এমন কি উচচ ও সুস্পষ্ট সাত্বিক গুণগত স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিলেও চলিবে না, তাহার স্থানে মানুষ যাহাকে পুণ্য বলে সেই অপ্রধান অপর্য্যাপ্ত বস্তু অপেক্ষা গভীরতর এবং অধিকতরভাবে স্বরূপগত কিছুকে বসাইতে হইবে। ইংরাজিতে **virtue** (পুণ্য) শব্দটির মূল মর্ম্ম ছিল **manhood** (মানবত্ব) ; আর এই মানবত্ব নৈতিক মন ও তাহার দ্বারা গঠিত বস্তু হইতে অধিকতর বৃহৎ ও গভীর। কর্ম্মযোগের চরমসিদ্ধি আরও উচচতর ও গভীরতর এক অবস্থা যাহাকে হয়ত আত্মভাব বা আত্মস্বরূপতা (**soulhood**) বলা যাইতে পারে,—কেননা আত্মার তত্ত্ব মানবত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ ; সে সিদ্ধি যখন আসিবে তখন এক পরম সত্য ও পরম প্রেমের কর্ম্মের মধ্য দিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে উৎসারিত আত্মস্বরূপতা মানবীয় পুণ্যের স্থান অধিকার করিবে। এই পরম সত্যকে ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধির ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতে বাধ্য করা যায় না, অথবা এমন কি ভাবনা ও কল্পনাপরায়ণ বৃহত্তর যুক্তিবুদ্ধি মানুষের সীমিত মনে শুদ্ধ সত্য বলিয়া যাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় তাহার সেই অধিকতর গৌরবময় সৌধরাজির মধ্যেও তাহাকে আবদ্ধ করা যায় না। আর এই পরম প্রেম মানবীয় আকর্ষণ সহানুভূতি ও করুণার অবিদ্যাচ্ছন্ন ভাবাবেগ-তাড়িত গতিবৃত্তির সহিত একার্থবাচক হওয়া ত দূরের কথা এ উভয়ে যে অবশ্যম্ভাবীরূপে সুসমঞ্জস হইবে একথাও বলা চলে না। ক্ষুদ্র বিধিবিধান বৃহত্তর গতিবৃত্তিকে বাঁধিতে পারেনা ; মনের আংশিক সিদ্ধি আত্মার পরম সার্থকতার উপর নিজের কোন সর্ত আরোপ করিতে, তাহার উপর কোন হুকুম চালাইতে পারে না।

প্রারম্ভে এই উচচতর প্রেম ও সত্য সাধকের আপন প্রকৃতির মূল বিধান ও ধারা অনুসারে তাহার মধ্যে নিজের গতিবৃত্তি সার্থক করিয়া তুলিবে। কেননা তাহাই দিব্যপ্রকৃতির বিশিষ্ট ভাব, পরাশক্তির বিশেষ রূপ, যাহার মধ্য

সাধারণতঃ আমরা নিজদিগকে ধারণা করি বিশ্বের মধ্যে এক বিবিক্ত অহং বলিয়া, যে অহং এক বিবিক্ত দেহ এবং বিবিক্ত মনোময় ও নৈতিক প্রকৃতিকে শাসিত ও পরিচালিত করে, পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাহার নিজ নির্দ্ধারিত কর্ম্ম বাছিয়া লয়, যে নিজে স্বতন্ত্র এবং সেইজন্য নিজের কর্ম্মের একমাত্র দায়িত্ব বুদ্ধিযুক্ত প্রভু। যে মন নিজের গঠন ও উপাদান সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে নাই সেই সাধারণ মনের পক্ষে কল্পনা করা সহজ নয় কিরূপে আমাদের মধ্যে এই আপাতপ্রতীয়মান অহমিকা ও তাহার রাজত্ব অপেক্ষা ধ্রুবতর গভীরতর এবং অধিকতর শক্তিশালী অন্য কিছু থাকিতে পারে, এমন কি যে মন বেশ চিন্তাশীল কিন্তু যাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা নাই তাহার পক্ষেও ইহা কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু যেমন আত্মজ্ঞান তেমনি ঘটনাবলীর প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রথম সোপানই হইল আপাতপ্রতীয়মান বস্তু-সত্যের পশ্চাতে গিয়া, দৃশ্যমান বাহ্য জগৎ যাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে সেই ধ্রুব কিন্তু মুখোশাবৃত মূল সক্রিয় সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করা।

এই অহং বা আমিত্ব একটি স্থায়ী সত্য নয় আমাদের মূল কোন অঙ্গ তো নহেই ; ইহা প্রকৃতির একটি রূপায়ণ মাত্র, ইহা আমাদের সংবেদন ও যুক্তি-বিচারশীল মনের মধ্যে ভাবনা কেন্দ্রীকরণের এক মনোময় মূর্ত্তি, আমাদের প্রাণের অংশগুলির মধ্যে ইহা আবেগ অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়চেতনা কেন্দ্রীকরণের এক প্রাণময় মূর্ত্তি ; আমাদের শরীরের মধ্যে বস্তুকে ও বস্তুর বৃত্তি ও ক্রিয়া-ধারাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অন্নময়রূপে সচেতনভাবে গ্রহণ করিবার জন্য এক যন্ত্র বা মূর্ত্তি। আমরা অন্তরে যাহা কিছু তাহা অহং নহে তাহা আমাদের চৈতন্য, আমাদের অন্তরাত্মা বা চিৎসত্তা। আমরা বাহ্যপ্রয়োগে বা বাহিরের ক্ষেত্রে যাহা কিছু, যাহা কিছু আমরা করি—তাহাও অহং নহে তাহা প্রকৃতি। কার্য্যনির্ব্বাহক এক বিশ্বশক্তি আমাদিগকে গঠিত বা রূপায়িত করিয়া তোলে এবং এইভাবে গঠিত আমাদের স্বভাব পরিবেশ ও মননশক্তির এবং বিশ্বশক্তিরাজির ব্যষ্টিভাবাপন্ন রূপায়ণের মধ্য দিয়া আমাদের কর্ম্ম ও তাহার ফলসকল নির্দ্দেশ ও নির্দ্ধারিত করে।

বস্তুতঃ আমরা ভাবি না, ইচ্ছা করি না, কর্ম্ম করি না, কিন্তু ভাবনা ও ইচ্ছা, আবেগ ও কর্ম্ম এ সকলই আমাদের মধ্যে ঘটে, আমাদের অহংবোধ আমাদের মধ্যে ঘটে, আর সেই অহংবোধ প্রকৃতির স্বাভাবিক কর্ম্মাবলির এই এই প্রবাহকে আপনার চারিদিকে একত্র এবং নিজের উপর আরোপ করে। বিশ্বশক্তি বা প্রকৃতিই ভাবনাকে রূপ দেয় ইচ্ছাশক্তিকে জাগাইয়া তোলে আবেগ ও প্রেরণাকে ফুটাইয়া তোলে। আমাদের দেহ মন ও অহমিকা

নবম অধ্যায়

সমতা ও অহমিকার বিনাশ

সর্ব্বাঙ্গীন আত্মোৎসর্গ, পরিপূর্ণ সমতা, অহমিকার সম্যক্ উচ্ছেদ, কর্ম্মের বর্ত্তমান অজ্ঞানাচ্ছন্ন ধারাগুলি হইতে আমাদের স্বভাবের মুক্তি ও রূপান্তর-সাধন, এই সোপানাবলি অবলম্বন করিয়া আমাদের সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতিকে ভগবদিচ্ছার নিকট সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত করিতে ও তাহাতে সফলকাম হইতে পারি—যে সমর্পণ হইবে প্রকৃতভাবে পরিপূর্ণরূপে ও নিঃশেষে আত্মদান। সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন আমাদের কর্ম্মের মধ্যে আত্মোৎসর্গের প্রবৃত্তি ও মনোভাব পূর্ণরূপে আনয়ন, তজ্জন্য প্রথমে চাই একটা নিত্যজাগ্রত সংকল্প, তাহাব পর আনা চাই তাহার জন্য সমগ্র সত্তার মজ্জাগত এক প্রয়োজনবোধ এবং সর্ব্বশেষে চাই যিনি আমাদের মধ্যে সর্ব্বভূতের মধ্যে এবং বিশ্বের সকল ক্রিয়াধারার মধ্যে সদাবিরাজিত সেই প্রচ্ছন্ন পরমশক্তির নিকট উৎসর্গরূপে সকল কর্ম্ম করিবার এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত কিন্তু জীবন্ত ও সচেতন অভ্যাস, স্বতঃপ্রেরিত হইয়া সর্ব্বদা সেই দিকে ফিরিয়া থাকা। আমাদের জীবন এই যজ্ঞের বেদী, আমাদের কর্ম্মাবলি তাহার নৈবেদ্য, যে পরমদেবতাকে আমরা এ নৈবেদ্য অর্পণ করি তিনি হইতেছেন সেই বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত সত্তা ও শক্তি যাহাকে আমরা আজিও দেখি নাই বা জানি নাই কেবল তাহার একটা অনুভূতি, একটা আভাস মাত্র পাইয়াছি। এই আহুতি ও আত্মোৎসর্গের দুইটি দিক আছে, প্রথমে রহিয়াছে আমাদের কর্ম্ম এবং তারপর রহিয়াছে যে ভাব লইয়া কর্ম্ম করি সেই ভাব—আমরা যাহা কিছু দেখি, ভাবনা ও অনুভব করি তৎসকলের মধ্যে কর্ম্মের প্রভুর প্রতি পূজার ভাব।

করণীয় কর্ম্ম প্রথমে স্থির করিতে হয় আমাদের অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে যত বেশী পরিমাণে জ্ঞানের আলোক দেখিতে পারা যায় তাহার সহায়তায়। কি করা উচিত তৎসম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে তাহা এইভাবে স্থির হয়। আমাদের কর্ত্তব্যবোধ দ্বারা বা মানবসঙ্গীগণের প্রতি আমাদের সমবেদনা বা সহানুভূতির দ্বারা অথবা অপরের বা জগতের মঙ্গলসাধনের ধারণার দ্বারা

বুঝিতে হইবে যে আমরা কর্ম্ম তাঁহার জন্য করিতেছি না, করিতেছি কর্ম্মে নিজের পরিতৃপ্তি ও সুখ আছে অথবা সক্রিয় প্রকৃতির কর্ম্মে আমাদের প্রয়োজন আছে কিম্বা আমাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হইবে বলিয়া ; কিন্তু এ সমস্তই অহমিকার আবাস ও আশ্রয়স্থল। আমাদের সাধারণ জীবনধারাতে এ সমস্তের যতই প্রয়োজন থাকুক না কেন, আধ্যাত্মিক চেতনার পরিণতিতে ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তৎস্থানে তাহাদের দিব্য পরিপূরক বস্তুরাজিকে বসাইতে হইবে, এক অপৌরুষেয় ভগবদভিমুখী আনন্দ অনালোকিত প্রাণময় পরিতৃপ্তি ও সুখকে দূর করিবে বা তৎস্থান অধিকার করিবে, দিব্যশক্তির আনন্দময় এক পরিচালনা সক্রিয় নিম্নপ্রকৃতির চাঞ্চল্যের স্থানে অধিরূঢ় হইবে ; প্রবৃত্তিচরিতার্থতার প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য আর থাকিবে না, তাহার স্থানে আসিবে মুক্ত আত্মা ও প্রদীপ্ত প্রকৃতির ক্রিয়ার স্বাভাবিক সক্রিয় সত্যের মধ্য দিয়া ভগবদিচ্ছার পরিপূরণ। পরিশেষে যেরূপে প্রথমে কর্ম্মফলের ও পরে কর্ম্মের আসক্তি হৃদয় হইতে অপসারণ করা হইয়াছে সেইভাবে আমরা যে কর্ম্মের কর্ত্তা এই ধারণা ও বোধের যে আসক্তি শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই যাইতে চাহে না তাহাকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে ; আমাদের অন্তরে ও ঊর্দ্ধে অধিষ্ঠিত দিব্যশক্তিকে একমাত্র ও যথার্থ কর্ম্মকর্ত্রী বলিয়া জানিতে ও অনুভব করিতে হইবে।

কর্ম্মে ও তাহার ফলে আসক্তিত্যাগ, মনে ও আত্মাতে এক পরম সমতা লাভের দিকে অগ্রসরশীল এক গতিবৃত্তির প্রাবল্য ; যদি চিৎস্বরূপের মধ্যে আমাদিগকে পূর্ণ হইয়া উঠিতে হয় তাহা হইলে এ গতিবৃত্তিকে সর্ব্বাবেষ্টনকারী হইতে হইবে। কেননা যিনি কর্ম্মের প্রভু তাঁহার পূজার জন্য আমাদের এবং সর্ব্ববস্তু ও সকল ঘটনার মধ্যে তাঁহাকে স্পষ্টভাবে চিনিতে পারা এবং আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করিয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজন। সমতা এ আরাধনার চিহ্ন ; এই সাম্যবোধই হইল অন্তরাত্মার সেই ক্ষেত্র যেখানে যথার্থ উৎসর্গ ও প্রকৃত পূজা সাধিত হইতে পারে। ভগবান সর্ব্বভূতে সমভাবে রহিয়াছেন, আমাদের ও অপরের, জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর, মিত্র ও শত্রুর, মানব ও পশুর, পুণ্যাত্মা ও পাপীর মধ্যে মূলতঃ কোন ভেদ করিলে চলিবে না। আমরা কাহাকেও ঘৃণা কাহাকেও অবজ্ঞা করিব না, কাহারও প্রতি আমাদের জুগুপ্সা থাকিবে না ; কেননা সকলের মধ্যেই আমাদের সেই অখণ্ড এককে দেখিতে হইবে যিনি আপন ইচ্ছার অনুরূপ ভাবে ব্যক্ত অথবা ছদ্মবেশে প্রকট হন। ইহাদের মধ্যে তিনি

আবার তেমনি আমাদের মনে ও আত্মাতে সকল ঘটনার প্রতি, তাহারা সুখ ও দুঃখ, জয় ও পরাজয়, মান ও অপমান, যশ ও অপযশ, সুদৈব ও দুর্দ্দৈব যে ভাবে বা যে রূপেই আসুক না কেন, আমরা একই সমত্ব রক্ষা করিব। কেননা প্রতি ঘটনাতেই আমরা সকল কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের প্রভুর এক ইচ্ছা, ভগবানের ক্রমবর্দ্ধমান আত্মপ্রকাশের এক ধাপ দেখিতে পাইব। যাহাদের দৃষ্টিসমর্থ আন্তর চক্ষু আছে তাহাদের নিকট যেমন সর্ব্বশক্তিতে, তাহাদের খেলা ও পরিণামে তেমনি সর্ব্ববস্তুতে ও সর্ব্বপ্রাণীতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। সব কিছুই চলিয়াছে এক পরম অভিব্যক্তির দিকে ; দুঃখ ও দৈন্যের অথবা সুখ ও পরিতৃপ্তির প্রত্যেকটি অনুভূতি সমপরিমাণে এক সার্ব্বভৌম গতিধারার এক একটি প্রয়োজনীয় সংযোজক (**link**), যাহাকে বুঝিতে পারা ও মানিয়া নেওয়া মানুষের অবশ্য করণীয় কার্য্য। আমরা অসংস্কৃত ও অবিদ্যাচ্ছন্ন সহজাত প্রবৃত্তির আবেগের বশেই তাহাকে নিন্দা বা তিরস্কার কিম্বা তাহার বিরুদ্ধাচারণ করি। অবশ্য অপরাপর বস্তুর মত বিশ্বনাট্যে বিদ্রোহের একটা স্থান একটা উপযোগিতা এমন কি একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, মানুষের গতিপথে তাহা সহায় হইয়া উঠিতেও পারে, তাহাদের যথাকালে ও যথাযথ স্তরে দিব্য পরিণতির জন্যই তাহা ভগবন্নির্দ্দিষ্ট ; তথাপি অবিদ্যাচ্ছন্ন বিদ্রোহের গতিবৃত্তি আত্মার শৈশবাবস্থার অথবা অপরিণত যৌবন কালের ব্যাপার। সুপরিণত আত্মা নিন্দাবাদ বা দোষারোপ করে না, সে বুঝিতে ও জয় করিতে চেষ্টা করে ; সে চিৎকার বা ঝগড়া করে না কিন্তু মানিয়া লয় এবং উন্নতিসাধন ও পূর্ণতা লাভের জন্য প্রয়াস পায় ; সে অন্তরে বিদ্রোহী হয় না, আজ্ঞা পালনের জন্য সার্থকতা ও রূপান্তর সাধনের জন্য পরিশ্রম করে। অতএব আমরা আত্মার সমভাব লইয়া দিব্যপ্রভুর হাত হইতে সব কিছু গ্রহণ করিব। দিব্য বিজয় না আসা পর্য্যন্ত আমরা পথ বা পাথেয় রূপে শান্তভাবে যেমন সাফল্য তেমনি পরাজয় স্বীকার করিয়া লইব। যদি দিব্য বিধানানুসারে আমাদের কাছে আসে তবে তীক্ষ্ণতম দুঃখ তাপ ও বেদনাতে যেমন আমাদের দেহ মন ও আত্মা অবিচলিত থাকিবে তেমনি তীব্রতম হর্ষ সুখ বা পুলকেও অনভিভূত রহিবে। এইভাবে এক পরম সাম্যে স্থিত হইয়া চলিবার পথে সকল বস্তুকে সমান শান্ত ভাবে গ্রহণ করিয়া আমরা দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে থাকিব, যতদিন আমরা উচ্চতর অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইয়া সার্ব্বভৌম পরমানন্দে প্রবেশ করিতে না পারি।

সত্য ব্যক্তিকে, কেন্দ্রগত শাশ্বত পুরুষকে, পরমপুরুষের এক দিব্য সত্তাকে পরাপ্রকৃতির এক শক্তি ও অংশকে * ক্রমশঃ প্রকাশ করে।

এখানেও এই যে গতিধারার দ্বারা অন্তরাত্মা তাহার অহংকাররূপ অন্ধকারময় আবরণটি খুলিয়া ফেলিয়া দেয় তাহার মধ্যেও অগ্রগতির সুস্পষ্ট বিভিন্ন স্তর আছে। কেননা শুধু কর্ম্মফলই যে ভগবানের তাহা নহে, আমাদের কর্ম্মকেও তাঁহারই হইতে হইবে; তিনি যেমন আমাদের কর্ম্মফলের তেমনি সমভাবেই আমাদের কর্ম্মেরও প্রকৃত অধীশ্বর। এ কথা আমাদিগকে ভাবনাময় মন দ্বারা শুধু বুঝিলে চলিবে না, আমাদের সমগ্র চেতনা ও সংকল্পে ইহাকে পূর্ণরূপে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে। সাধককে ইহা শুধু ভাবনায় যে জানিতে হইবে তাহা নহে, তাহাকে কর্ম্মের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র প্রণালীর সর্ব্বত্রই বাস্তব প্রত্যক্ষ ও গভীর অনুভূতি লইয়া বুঝিতে ও দেখিতে হইবে যে কর্ম্ম একেবারেই তাহার নিজের নহে, কিন্তু পরম সৎস্বরূপ হইতেই তাহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। একটা শক্তি একটা সান্নিধ্য একটা সংকল্প যে তাহার ব্যষ্টি-প্রকৃতির মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতেছে এ সম্বন্ধে তাহাকে সর্ব্বদা সচেতন হইতে হইবে। কিন্তু সাধনধারার এই পরিবর্ত্তনের সময় এ-বিপদ আসিতে পারে যে সাধক নিজের ছদ্মবেশী বা ঊর্দ্ধে উন্নীত অহমিকা বা অন্য কোন অধস্তন শক্তিকে দিব্যপ্রভু বলিয়া ভুল করিতে এবং তাহার দাবিকে ভগবানের চরম আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। নিম্নপ্রকৃতির প্রায় সর্ব্বদা সংঘটিত এই অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা অভিভূত হইয়া উচ্চতর শক্তির কাছে তাহার তথাকথিত সমর্পণকে বিকৃত করিয়া তাহার হঠকারিতার, এমন কি তাহার কামনা বাসনার অসংযত অতি-প্রশ্রয় দিবার ছুতা ও ছলনা করিয়া তুলিতে পারে। সাধনার দাবি এই যে আমাদের সচেতন মনে এক অকপট সরলতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, আর শুধু তাহাই নহে, যাহা নানা প্রচ্ছন্ন গতিবৃত্তিতে ভরা আমাদের সেই অধিচেতন (**subliminal**) অংশে সে সরলতাকে বসানো তদপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কারণ সেখানেই বিশেষতঃ আমাদের প্রাণপ্রকৃতির মগ্নচৈতন্যে রহিয়াছে এক প্রতারক ও অভিনেতা, যাহাকে সংশোধন করা অতিদুরূহ ব্যাপার। সাধক তাহার কামনা-বিলোপের এবং সকল কর্ম্ম ও সকল ঘটনাতে অন্তরাত্মার সমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার কার্য্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া যাইবার পূর্ব্বে তাহার সকল কর্ম্মের বোঝা ভগবানের চরণে পূর্ণরূপে নামাইয়া দিতে সমর্থ হইবে না।

* অংশ সনাতনঃ, পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা

প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাকে চলিতে হইবে অহমিকার প্রবঞ্চনারাজি এবং বিপথে চালনাকারী অন্ধকারের সেই সমস্ত শক্তির অতর্কিত আক্রমণের উপর সতর্ক ও সাবধান দৃষ্টি রাখিয়া, যাহারা আলোক ও সত্যের একমাত্র উৎস বলিয়া নিজেদিগকে চালাইতে চায় এবং সাধকের অন্তরাত্মাকে নিজেদের খপ্পরে টানিয়া আনিবার জন্য ছল করিয়া দিব্যমূর্ত্তির অনুরূপ সব মূর্ত্তি ধারণ করে।

সাধককে অবিলম্বে এক অগ্রবর্ত্তী ধাপে উত্তীর্ণ হইয়া নিজেকে সাক্ষীর স্থানে বসাইতে হইবে। প্রকৃতি হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া লইয়া, নৈর্ব্ব্যক্তিক ও বীতরাগ হইয়া, কার্য্যসাধিকা প্রকৃতিশক্তি কি ভাবে তাহার মধ্যে কার্য্য করে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে এবং তাহার সে ক্রিয়াধারাকে বুঝিতে হইবে। এইভাবে পৃথক থাকিয়া তাহাকে বিশ্বশক্তিরাজির খেলা চিনিতে ও বুঝিতে হইবে, বুঝিতে হইবে প্রকৃতি আলোক ও অন্ধকার, দিব্য ও অদিব্য ভাব সহযোগে কিরূপে কর্ম্মের এক জাল বয়ন করিয়া চলিয়াছে আর খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে বিশ্বপ্রকৃতির সেই সমস্ত প্রচণ্ড শক্তি ও সত্তারাজিকে যাহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষকে ব্যবহার করিতেছে। গীতায় বলা হইয়াছে যে প্রকৃতি তাহার তিন গুণের মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করে,—আলোক ও মঙ্গলের গুণ (সত্ত্ব), আবেগ ও কামনার গুণ (রজ) এবং অন্ধকার ও জড়তার গুণ (তম)। বিবেচক ও নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে সাধককে তাহার প্রকৃতির এই রাজ্য মধ্যে যাহা কিছু ঘটিতেছে, গুণত্রয় কিভাবে পৃথক থাকিয়া ও মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছে তাহা পৃথক করিয়া বুঝিতে হইবে; আপন সত্তার অভ্যন্তরে বিশ্বশক্তির সূক্ষ্ম অদৃশ্য বা ছদ্মবেশী যে ক্রিয়াধারা নানা অলিগলির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে তাহাকে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে; সেই গোলকধাঁধার সকল জটিলতার রহস্য জানিতে হইবে। এই জ্ঞানের পথে যেমন সে অগ্রসর হইতে থাকিবে তেমনি প্রকৃতির অজ্ঞানাচ্ছন্ন যন্ত্র আর না থাকিয়া তাহার অনুমন্তা হইতে সমর্থ হইবে। প্রারম্ভে সাধকের বিভিন্ন অঙ্গের উপর ক্রিয়াশীল প্রকৃতি-শক্তি যাহাতে তাহার ক্রিয়াধারায় তাহার নিম্নতর গুণদ্বয়কে জয় করিয়া তাহাদিগকে আলোক ও মঙ্গলের গুণের (সত্ত্বগুণের) অধীন করিয়া লইতে পারে তজ্জন্য তাহাকে প্ররোচিত করিতে হইবে, তাহার পর আবার তাহাকে এমনভাবে আত্মদানের জন্য রাজি করাইতে হইবে যাহাতে এই তিন গুণই এক উচ্চতর শক্তির দ্বারা রূপান্তরিত হইতে, তাহাদের দিব্যরূপে পরিণত হইতে পারে—তমোগুণ পরম অবিকম্পিত প্রশান্তিতে, রজোগুণ শাশ্বত সক্রিয় দিব্য চিৎতপসে, সত্ত্বগুণ দিব্য জ্যোতি ও আনন্দে। আমাদের মধ্যস্থিত মনোময়

নাম দেওয়া হইয়াছে সত্ত্ব, রজ ও তম। সত্ত্ব হইল সাম্যের শক্তি, মঙ্গল ও সুসঙ্গতি, সুখ ও আলোক এই গুণগুলির মধ্য দিয়া তাহার প্রকাশ হয়; রজ হইল গতিবৃত্তির শক্তি, সংঘর্ষ ও প্রচেষ্টা, আবেগ ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া হয় তাহার প্রকাশ; তম নিশ্চেতনা ও জড়তার শক্তি তাহার প্রকাশে যে গুণাবলি দেখা দেয় তাহারা হইল অন্ধকার, অসামর্থ্য ও নিষ্ক্রিয়তা। এই গুণত্রয়বিভাগ সাধারণতঃ মনস্তাত্ত্বিক আত্মবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কিন্তু জড়প্রকৃতির ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। নিম্নপ্রকৃতিতে প্রতি বস্তু প্রতি সত্তার মধ্যে এ ত্রিগুণ রহিয়াছে আর প্রকৃতির ক্রিয়াধারা ও সক্রিয় রূপ এই সমস্ত গুণপরতন্ত্র শক্তি-রাজির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল।

সজীব বা নির্জীব, বস্তুর প্রত্যেকটি রূপ হইল গতিশীল প্রাকৃতিক শক্তি-রাজির এক সর্ব্বদা-রক্ষিত সাম্য, আর তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত অন্যান্য শক্তি ব্যূহের অনুকূল প্রতিকূল বা বিধ্বংসী সংস্পর্শ বা অভিঘাত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় তাহার উপর আসিয়া পড়িতেছে। আমাদের নিজেব মন প্রাণ ও দেহের প্রকৃতি এইরূপ এক গঠনক্ষম শক্তিব্যূহ ও সাম্য ছাড়া আর কিছু নহে। পরি-বেশ হইতে আগত সংঘাত ও সংস্পর্শ ও তাহাদের প্রতিক্রিয়ার গ্রহণ বিষয়ে গুণত্রয়ই গ্রহীতার প্রকৃতি এবং প্রতিস্পন্দনেব স্বভাব নির্ণয় করিয়া দেয়। অসাড় ও অপটু হইয়া, আপতিত সংস্পর্শরাজির প্রতিস্পন্দনরূপে কোন সাড়া না দিয়া, আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা না করিয়া, পরিপাক ও নিজের অঙ্গীভূত অথবা উপযোগী করিয়া লইতে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগকে সে ঘাড় পাতিয়া লইতে পারে, ইহাই হইল তমোগুণ, জড়তাব রীতি। তামসিকতার লক্ষণচিহ্ন ও কলঙ্ককালিমা হইল দৃষ্টিশূন্যতা ও জ্ঞানহীনতা, অক্ষমতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা, জড়তা ও অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা ও যান্ত্রিক গতানুগতিকতা; আর মনের অসাড়তা, প্রাণের নিদ্রা ও আত্মার সুষুপ্তি। যদি অপর কোন উপাদানের সাহায্যে ইহাকে শোধন করা না যায়, তাহা হইলে নূতন কোন রূপ সৃষ্টি অথবা নূতন কোন সাম্য বা প্রগতির কোন শক্তিকে প্রবর্ত্তিত না করিয়া বর্ত্তমান রূপ বা প্রাকৃতিক সাম্যকে ভাঙ্গিয়া ফেলা ছাড়া ইহার পরিণাম আর কিছু হইতে পারে না। এই অসাড় শক্তিহীনতার কেন্দ্রস্থানে আছে অজ্ঞানের তত্ত্ব; আর রহিয়াছে প্রণোদনাদায়ী বা আক্রমণকারী সংস্পর্শ, পারিপার্শ্বিক শক্তিরাজির ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা এবং নূতন অনুভূতির দিকে তাহাদের প্ররোচনাকে বুঝিবার, ধরিবার বা কাজে লাগাইবার অসামর্থ্য এবং অলস অনিচ্ছা।

পক্ষান্তরে প্রকৃতির সংস্পর্শে গ্রহীতা, প্রকৃতির শক্তিরাজির দ্বারা স্পৃষ্ট অনুপ্রাণিত অনুরুদ্ধ বা আক্রান্ত হইয়া তাহাদের চাপে সাড়া দিতে অথবা

ভূমিতে নামিয়া আসে তখন তাহারাও রজোগুণের দ্বারা অধিকৃত ও এইভাবে অযথাভাবে ব্যবহৃত হওয়ার হাত এড়াইতে পারে না। তমোগুণ অনালোকিত এবং রজোগুণ অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া গেলে দিব্য রূপান্তর বা দিব্য জীবন লাভ অসম্ভব।

মনে হইতে পারে যে অপর দুইটিকে বাদ দিয়া শুধু সত্বগুণকে আশ্রয় করিলে মুক্তির উপায় পাওয়া যাইতে পারে: কিন্তু মুশ্কিল এই যে কোন একটি গুণ তাহার অন্য দুই সঙ্গী ও প্রতিদ্বন্দীকে ছাড়িয়া একাকী দাঁড়াইতে পারে না। কামনা বাসনা ও আবেগের গুণকে সকল বিক্ষোভ পাপ দুঃখ ও যন্ত্রণার কারণ বলিয়া দেখিতে পাইয়া যদি তাহাকে দমিত ও বশীভূত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ও পরিশ্রম করি, তাহা হইলে রজোগুণ হ্রাস পায় বটে কিন্তু তমোগুণ মাথা খাড়া করিয়া উঠে। কেননা সক্রিয়তার তত্ত্ব যদি নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহা হইলে তামসিকতা তৎস্থান অধিকার করিয়া বসে। আলোকের তত্ত্ব এক স্থির শান্তি সুখ প্রেম যথাযথ মনোবৃত্তি আনিয়া দিতে পারে বটে কিন্তু রজোগুণ যদি না থাকে অথবা তাহাকে যদি পূণ-রূপে দমিত করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে অন্তরাত্মার নিস্তব্ধতা নিষ্ক্রিয়তার স্থৈর্য্য হইয়া দাঁড়ায়, সক্রিয় রূপান্তরের দৃঢ় ভিত্তি হয় না। এ অবস্থায় আমাদের স্বভাব অফলপ্রসূ থাকিয়াই সৎ সৌম্য ও প্রশান্ত, যথাযথ চিন্তাশীল যথাযথ কর্ম্ম-পরায়ণ হইতে পারে। সক্রিয় অংশে আমাদের প্রকৃতি তখন হইয়া দাঁড়াইতে পারে সত্ত্ব-তামসিক, উদাসীন মলিন নির্বীর্য্য অথবা সৃষ্টিশক্তিহীন। তখন মানসিক ও নৈতিক অন্ধকার না থাকিতে পারে কিন্তু তেমনি কর্ম্মের উদ্দীপনা হ্রাস পাইতে পারে, কর্ম্মের পথে ইহা এক প্রতিরোধকারী সীমাবদ্ধতা, অন্য এক প্রকার অক্ষমতা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কেননা তমস্ একটা দ্বয়ীতত্ত্ব; ইহা যেমন জড়তা দ্বারা রজোগুণের বিরোধিতা তেমনি সংকীর্ণতা অজ্ঞান ও অন্ধকার দ্বারা সত্বগুণের প্রতিকূলতা করে এবং সত্তার মধ্যে সত্ত্ব ও রজের কোনটি যদি হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে তবে তাহার স্থান অধিকার করিবার জন্য নিজেকে তথায় প্রবাহিত করিয়া দেয়।

আবার এই ভুল সংশোধন করিবার জন্য যদি আমরা রজোগুণকে ডাকিয়া আনি, তাহাকে সত্বগুণের সহিত মিত্রতা স্থাপনের আদেশ প্রদান করি এবং তাহাদের মিলিত শক্তি দ্বারা অন্ধকারের তত্ত্ব অপসারণ করিতে প্রয়াস পাই, তখন আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের কর্ম্মকে উর্দ্ধে তুলিয়াছি বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখি যে আমরা রাজসিক অধীরতা, আবেগ উত্তেজনা, নৈরাশ্য দুঃখ ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছি। এই সমস্ত গতিবৃত্তি

খেলা পূর্ণরূপে দেখিতে এবং তাহার সকল শাখাপ্রশাখা সকল আবরণ ও সকল চাতুর্য্যের মধ্যে তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে পারে—কেননা, সে খেলা নানাপ্রকার লুকোচুরি ও বঞ্চনা, ছদ্মবেশ ও ফাঁদ, বিশ্বাসঘাতকতা ও ছলনাতে ভরা। এ সময় সাধক দীর্ঘ অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষা পাইয়া, সকল কর্ম্ম ও সকল অবস্থাকে গুণত্রয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বলিয়া জানিয়া, তাহাদের সকল প্রণালী বা পদ্ধতি বুঝিতে পারিয়া, তাহাদের আক্রমণে আর অভিভূত হইয়া পড়িবে না, তাহাদের ফাঁদে অতর্কিতে আবদ্ধ অথবা তাহাদের ছদ্মবেশ দ্বারা আর প্রতারিত হইবে না। সেই সঙ্গে সে বুঝিতে পারিবে যে তাহার অহমিকা গুণত্রয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক কৌশল এবং তাহাদিগকে বজায় রাখিবার এক গ্রন্থি ছাড়া আর কিছু নয়; আর ইহা বুঝিতে পারিয়া সে অহংগত অধস্তন প্রকৃতির ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইবে। সে তখন সাধুসন্ত ভাবুক মনীষী ও পরহিতব্রতীর সাত্ত্বিক অহংকার হইতে মুক্ত হইবে; স্বার্থসন্ধানী রাজসিক অহংকারের শাসন হইতে তাহার প্রাণময় আবেগ ও প্রেরণারাজিকে ছাড়াইয়া লইবে, সে আর স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত উগ্রকর্ম্মী অথবা কামনা বাসনার প্রশ্রয়প্রাপ্ত বন্দী অথবা তাহাদের ডিঙার উপর গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া দাঁড়টানায় রত কৃতদাস থাকিবে না; বুদ্ধিহীন জড়ভাবাপন্ন মানবজীবনের সাধারণ চক্রাবর্ত্তনে আসক্ত অবিদ্যাচ্ছন্ন অথবা নিষ্ক্রিয় সত্তার তামসিক অহংকারকে সে তখন জ্ঞানের আলোকে বিনষ্ট করিবে। আমাদের ব্যক্তিগত সকল ক্রিয়াতে অহং-বোধই যে মূল পাপ ইহা নিশ্চিতরূপে জানিয়া ও বুঝিয়া সে আর রাজসিক বা সাত্ত্বিক অহংকারের মধ্যে আত্মসংশোধন ও আত্মমুক্তির উপায় খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইবে না, বরং সেজন্য প্রকৃতির যন্ত্রাবলি ও ক্রিয়ারাজিকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে শুধু কর্ম্মের অধীশ্বর ও তাঁহার পরাশক্তি ও পরমাপ্রকৃতির মুখাপেক্ষী হইবে। যেখানে সকল সত্তা শুদ্ধ ও মুক্ত, কেবলমাত্র তথায় দিব্য সত্যের রাজত্ব সম্ভবপর।

এই প্রগতির প্রথম ধাপ হইল কতকটা অনাসক্ত হইয়া প্রকৃতির গুণত্রয়ের উপরে উঠা। অন্তরাত্মা তখন অন্তরে নিম্নতর প্রকৃতি হইতে পৃথক ও বিমুক্ত হইয়া পড়ে, তাহার বন্ধনপাশে বিজড়িত থাকে না, উদাসীনভাবে ঊর্দ্ধে আনন্দে সমাসীন হয়। প্রকৃতি তাহার পুরাতন অভ্যাসমত ত্রিগুণের চক্রাবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কাজ করিয়া চলে—কামনা বাসনা হর্ষ বিষাদ হৃদয়কে আক্রমণ করে, কর্ম্মের যন্ত্রগুলি নিষ্ক্রিয় অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, আবার হৃদয়ে দেহে ও মনে আলোক ও শান্তি ফিরিয়া আসে; কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্ত্তন আর আত্মাকে স্পর্শ বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। অন্তরাত্মা অধস্তন

বৈচিত্র্যকে ধারণ ও পোষণ করিবে। আমাদের সবল ও সক্রিয় প্রাণময় অঙ্গ-সমূহের আমাদের স্নায়ুগত ভাবাবেগময় ইন্দ্রিয়ানুভূতিশীল ও সংকল্পময় সত্তার শক্তির পরিসর বৃদ্ধি পাইবে, তাহাদের মধ্যে এক অক্লান্ত কর্ম্ম ও আনন্দময় উপভোগের অনুভূতি প্রবেশাধিকার লাভ করিবে ; কিন্তু তাহারই সঙ্গে তাহারা এক উদার, আত্মস্থ, আত্মায় সমতাপ্রাপ্ত, শক্তিতে মহান, স্থৈর্য্যে দিব্য এক প্রশান্তির উপর দাঁড়াইতে শিখিবে, যাহা উৎফুল্ল বা উত্তেজিত, দুঃখতাপে ক্লিষ্ট, কামনা বাসনা ও আবেগের সনির্ব্বন্ধ তাড়নায় উৎপীড়িত অথবা আলস্য ও অক্ষমতা বশে হতোদ্যম হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা অনুভব ও বিচারশীল মন তাহার সাত্ত্বিক সীমাবন্ধনকে অতিক্রম করিয়া এক স্বরূপগত জ্যোতি ও শক্তির কাছে নিজেকে উন্মীলিত করে। তখন এক অনন্ত জ্ঞান আমাদের কাছে তাহার গৌরবোজ্জ্বল ক্ষেত্ররাজি উন্মুক্ত করিবে, যে জ্ঞান মানসরূপায়ণরাজি দ্বারা গঠিত অথবা মনের ধারণা ও মতামতের দ্বারা সীমিত নয়, যাহা ভ্রমপ্রমাদযুক্ত অনিশ্চিত যুক্তিতর্কের এবং ইন্দ্রিয়ের ক্ষুদ্র আশ্রয়ের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু ধ্রুব ও প্রমাণসিদ্ধ সে-জ্ঞান সব কিছুর মধ্যে প্রবেশ কবিতে সমর্থ, সব কিছু তাহার বোধগম্য ; তাহা এক অপার আনন্দ ও শান্তি, যাহা সৃজনী শক্তির ও সবল ক্রিয়ার বাধাগ্রস্ত কঠোর উদ্যমশীলতার হাত হইতে মুক্তির উপর নির্ভর করে না, যাহা ক্ষুদ্র সীমিত হর্ষসুখের কয়েকটি উপাদান দিয়া গঠিত নয় কিন্তু যাহা স্বয়ম্ভূ ও সর্ব্বগ্রাহী, যাহা প্রকৃতিকে অধিকার করিবার জন্য সংখ্যা ও বিস্তারে নিত্যবর্দ্ধমান প্রণালীরাজির মধ্য দিয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ভূমিতে নিজেকে প্রবাহিত করিয়া দেয়। তখন মন প্রাণ ও দেহের উর্দ্ধস্থিত এক উৎস হইতে এক উচ্চতর শক্তি আনন্দ ও জ্ঞান নামিয়া আসিয়া এক দিব্যতর প্রতিরূপে পুনরায় প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য তাহাদিগকে অধিকার করে।

এইখানে আমাদের নিম্নতর জীবনের তিন গুণের সকল অসঙ্গতি অতিক্রান্ত হইয়া যায় এবং দিব্য প্রকৃতির বৃহত্তর গুণত্রয় দেখা দিতে আরম্ভ করে। তখন তম বা জড়তার অন্ধকার আর থাকে না। তমের স্থানে আসে এক দিব্য প্রশান্তি ও স্থির শাশ্বত বিশ্রান্তি যাহার মধ্য হইতে জ্ঞান ও কর্ম্মের খেলা মুক্ত হইতে থাকে যেন তাহারা শান্ত সমাহিত একাগ্রতার পরম মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। রাজসিক গতি ও চঞ্চলতাও থাকে না, থাকে না বাসনা, থাকে না ক্রিয়া সৃষ্টি ও অধিকারের জন্য সুখ ও দুঃখে ভরা প্রচেষ্টা, বিক্ষুব্ধ উত্তেজনার বহুফলপ্রসূ বিশৃঙ্খলা। রজের স্থান অধিকার করে এক আত্মধৃত সামর্থ্য ও অসীম শক্তির খেলা, যাহা অতি ক্ষুব্ধ তীব্রতার মধ্যেও আত্মার অচঞ্চল সমতাকে বিকম্পিত, তাহার প্রশান্তির বিরাট গভীর আকাশপটে অথবা

যদি মনে হয় যে ফল পাওয়া যাইবে না অথবা পাইতে বহু বিলম্ব হইবে তাহা হইলে সে তাহার আদর্শ ও তাহার পরিচালনা এ উভয়ের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া বসে। কারণ তাহার মন সর্ব্বদা পদার্থের বাহ্যরূপ দেখিয়াই বিচার করে, ইহাই হইল তাহার মজ্জাগত অভ্যাস কেননা যুক্তিবুদ্ধিকে সে অত্যধিকরূপে বিশ্বাস করে। যখন আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করি অথবা অন্ধকারের মধ্যে যখন আমাদের পদস্খলন ও পতন হয়, যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছিলাম যখন তাহা পরিবর্জন করিতে চাই, তখন আমাদের হৃদয়ে ভগবানকে দোষী সাব্যস্ত করা অপেক্ষা সহজ আর কিছুই নাই। কারণ আমরা তখন বলি "আমি পরমপুরুষকে বিশ্বাস করিয়াছি তথাপি দুঃখ পাপ ও ভ্রান্তির হাতে অন্যায়রূপে সমর্পিত হইয়াছি।" অথবা বলি "একটা আদর্শের জন্য আমি সমগ্র জীবন পণ করিয়াছি কিন্তু দেখিতেছি কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতা সে আদর্শের বিরোধিতা ও তাহাকে হতোদ্যম করিতেছে। ইহাপেক্ষা অন্যলোকের মত নিজের সসীমতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া জগতের সাধারণ অভিজ্ঞতার দৃঢ় ভূমিতে বিচরণ করা অনেক ভাল ছিল।" এইরূপ অবস্থায়—আবার কখন কখন এ অবস্থা বহুবার আসে এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হয়—মানুষ তাহার সকল উচ্চতর অনুভূতির কথা ভুলিয়া যায় তাহার হৃদয় কেন্দ্রীভূত হয় নিজের তিক্ত-বিরক্তির উপর। এই সমস্ত অন্ধকারময় অবস্থায় সাধকের স্থায়ী অধঃপতন এবং দিব্যকর্ম্ম হইতে ফিরিয়া দাঁড়ানো সম্ভবপর হয়।

যদি কেহ স্থিরচিত্তে দীর্ঘকাল ধরিয়া যোগের পথে অগ্রসর হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রবলতম বিরোধী চাপেও তাহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা বজায় থাকিবে; এমন কি যদি তাহা লুক্কায়িত অথবা দৃশ্যতঃ পরাভূত হইয়াছে মনেও হয় তথাপি প্রথম সুযোগেই তাহা পুনরায় প্রকট হইয়া উঠিবে। কেননা হীনতম অধঃপতন সত্ত্বেও এবং দীর্ঘতম কালব্যাপী ব্যর্থতার মধ্যেও হৃদয় অথবা বুদ্ধি অপেক্ষা উচ্চতর কিছু তাহাকে ধারণ করিয়া রাখে। কিন্তু এই ভাবের দ্বিধাসঙ্কোচ বা মেঘাচ্ছন্নতা অভিজ্ঞ সাধকেরও প্রগতির বেগ মন্দীভূত করিয়া দেয় আর প্রবর্ত্ত সাধকের পক্ষে তাহা অত্যন্ত বিপদজনক। সুতরাং পথের অতীব দুরূহতার কথা প্রথম হইতেই বুঝিয়া ও মানিয়া লওয়া প্রয়োজন, আর প্রয়োজন উপলব্ধি করা যে এমন এক সবল বিশ্বাস আমাদের চাই যাহা মনের নিকট অন্ধ বলিয়া বোধ হইলেও আমাদের বিচার বুদ্ধির অপেক্ষা অনেক বেশী জ্ঞানী। কেননা এই বিশ্বাস উর্দ্ধ হইতে প্রাপ্ত এক অবলম্বন; যাহা বুদ্ধি ও তাহার স্বীকৃত

যোগের প্রভুই শুধু জানেন যে কি করিতে হইবে, আমাদের অবশ্যকরণীয় হইল তাঁহাকে তাঁহার আপন ধারাতে আপন প্রণালীতে কর্ম্ম করিতে দেওয়া।

অজ্ঞানের গতিবিধি মূলতঃ অহংগত আর যতদিন আমরা ব্যক্তিসত্তাকে স্বীকার করি এবং আমাদের অপূর্ণ প্রকৃতির অর্দ্ধ আলোকে অর্দ্ধশক্তি লইয়া কর্ম্ম করি ততদিন আমাদের পক্ষে অহংকারকে বর্জন করা অপেক্ষা দুঃসাধ্য ব্যাপার আর কিছু নাই। কর্ম্মপ্রণোদনা ত্যাগ করিয়া অহংকে অনশনে অবসন্ন করা অথবা ব্যক্তিত্বের সকল গতিবৃত্তি আমাদের সত্তার মধ্য হইতে কাটিয়া দূরে নিক্ষেপের দ্বারা তাহাকে হত্যা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রশান্তির ভাব-সমাধিতে বা দিব্যপ্রেমের পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া অহমিকাকে আত্ম-বিস্মৃতির ক্ষেত্রে তুলিয়া দেওয়াও অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু আমাদের কঠিনতর সমস্যা হইল প্রকৃত ব্যক্তিপুরুষকে মুক্ত করা এবং দিব্য মানবত্ব লাভ করা যে মানবত্ব হইবে দিব্যশক্তির বিশুদ্ধ আধার ও দিব্য ক্রিয়ার পরিপূর্ণ যন্ত্র। এজন্য দৃঢ়ভাবে একটির পর একটি পদক্ষেপ করিতে হইবে : সর্ব্বতো-ভাবে বাধার পর বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে হইবে। কেবলমাত্র দিব্য জ্ঞান ও শক্তি আমাদের জন্য এ কাজ করিতে পারে এবং করিয়াও দিবে যদি আমরা পরিপূর্ণ বিশ্বাস লইয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করি, অবিরাম সাহস ও ধৈর্য্যসহকারে তাঁহার ক্রিয়াধারাবলিতে সম্মতি দান এবং অনুসরণ করি।

এই দীর্ঘপথের প্রথম ধাপ হইল আমাদের ও জগতের অন্তরে অধিষ্ঠিত ভগবানের চরণে আমাদের সকল কর্ম্ম যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা ; এই উৎসর্গ হৃদয় ও মনের এক বিশেষ ভাব বা ভঙ্গী যাহার সূত্রপাত করা তত কঠিন নহে, কিন্তু তাহাকে পূর্ণরূপে ঐকান্তিক ও সর্ব্বব্যাপী করিয়া তোলা অতি দুরূহ। দ্বিতীয় ধাপ আমাদের কর্ম্মের ফলে আসক্তিত্যাগ, কেননা আমাদের উৎসর্গের একমাত্র প্রকৃত অবশ্যম্ভাবী এবং পরম বাঞ্ছিত ফল—আর একমাত্র যাহার প্রয়োজন আমাদের আছে—হইল আমাদের মধ্যে দিব্য অধিষ্ঠান এবং দিব্য চৈতন্য ও শক্তির উপলব্ধি ; আবার এইটি লাভ হইলে বাকি সব কিছু পাওয়া যাইবে। এই ধাপের অর্থ আমাদের প্রাণময় সত্তার অহংগত সংকল্পের, আমাদের কামময় আত্মা ও কামময় প্রকৃতির রূপান্তর, আর ইহা প্রথম ধাপ অপেক্ষা অনেক বেশী কঠিন। তৃতীয় ধাপ হইল কর্ম্মীর কেন্দ্রগত অহমিকা এমন কি অহংবোধের বিলোপসাধন ; সকল রূপান্তরের মধ্যে এই ধাপই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ এবং প্রথম দুইটি ধাপ গৃহীত না হইলে ইহাতে পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না ; কিন্তু প্রথম দুইটি ধাপও সিদ্ধ হয় না যদি তৃতীয়টি

দ্বারা সে মানবজাতির পথ পরিষ্কার অথবা বিশাল সংগঠনের দ্বারা তাহার প্রগতি-পথে একটা সাময়িক বিশ্রাম স্থান নির্ম্মাণ করিতেছে। হয়ত সে দুষ্কৃতেব দণ্ডদাতা অথবা আলোক ও আরোগ্য বিধাতা, সুকুমার স্রষ্টা বা জ্ঞানের অগ্রদূত। অথবা যদি তাহার কর্ম্ম ও তাহার পরিণাম ক্ষুদ্রতর ধরণের হয় যদি তাহার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয় তবুও তাহার এই দৃঢ় বোধ থাকিতে পারে যে সে নিজে একটি যন্ত্র, তাহার নিজের বিশিষ্ট জীবনব্রত এবং বিশিষ্ট কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত। এইরূপ যাহাদের ভবিতব্যতা, এইরূপ যাহাদের শক্তি, তাহারা সহজেই বিশ্বাস ও ঘোষণা করে যে তাহারা ভগবানের বা নিয়তির হাতের যন্ত্র; কিন্তু এই ঘোষণার মধ্যেও এমন এক তীব্রতর অতিস্ফীত অহমিকা প্রবেশ বা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে সাধারণ মানুষ যাহাকে প্রতিষ্ঠা করিতে সাহস করে না বা অন্তরে স্থান দেওয়ার শক্তি রাখে না। এই প্রকার মানুষেরা যদি প্রায়শই ভগবানেব কথা বলে তবে তাহা নিজেদের এক প্রতিমূর্ত্তি খাড়া করিবার জন্যই বলে, যে-প্রতিমূর্ত্তি প্রকৃতপক্ষে তাহাদেব অথবা তাহাদের প্রকৃতির এক বিশাল ছায়া ছাড়া আর কিছু নহে : ইহা সেই বস্তুরই প্রতিমূর্ত্তি যাহা তাহাদের নিজ স্বভাবের অনুরূপ সংকল্প ভাবনা গুণ ও শক্তির পরিপোষক এবং যাহাতে মানুষই দেবত্ব আরোপ করিয়াছে। নিজের অহমিকার এই অতিবর্দ্ধিত প্রতিরূপকে তাহারা প্রভু বলিয়া সেবা করে। যোগের পথে ইহা প্রায়ই ঘটে যখন সবল কিন্তু স্থূল প্রাণপ্রকৃতি বা মন সহজেই উচচগৌরবে সমাসীন হইয়া দুরাকাঙক্ষা দম্ভ বা নিজে বড় হইবার বাসনাকে আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে এবং কর্ম্মপ্রণোদনার বিশুদ্ধি নষ্ট করিতে দেয়, তাহাদের ও তাহাদের প্রকৃত সত্তার মধ্যে এক অতিস্ফীত অহমিকা আসিয়া দাঁড়ায় এবং তাহাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল দিব্য বা অদিব্য যে বৃহত্তর অদৃশ্যশক্তি সম্বন্ধে তাহারা অস্পষ্ট বা অতিস্পষ্টভাবে সচেতন হয় তাহার সামর্থ্য নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই অধিকার করে। আমাদের অপেক্ষা এক বৃহত্তর শক্তি আছে এবং আমরা তাহা দ্বারা পরিচালিত হইতেছি শুধু এই মনোময় অনুভূতি বা প্রাণময় বোধ অহমিকার কবল হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না।

আমাদের মধ্যে বা উর্দ্ধে এক বৃহত্তর শক্তি আছে এবং আমাদিগকে পরি-চালিত করিতেছে এই অনুভূতি এই বোধ এক ভ্রান্তি অথবা গৌরবের বশে জাত এক উন্মাদনা নহে। যাহারা এইরূপ ভাবে দেখে ও অনুভব করে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তাহাদের দৃষ্টিশক্তি অধিক, তাহারা সীমিত দেহগত বুদ্ধিকে

অদ্বয় শাশ্বত অনন্তের চিন্ময় অংশ, যাহাকে পরা ভাগবতী শক্তি আপন কাজের জন্য নিজের মধ্যেই প্রসারিত ও স্থাপিত করিয়াছেন।

দিব্য শক্তির কাছে আমাদের যান্ত্রিক অহমিকাকে সমর্পণ করিবার পর আমাদিগকে তদপেক্ষা এক বৃহত্তর সোপানে আরূঢ় হইতে হইবে। যে অদ্বয় বিশ্বশক্তি আমাদিগকে এবং সর্ব্বপ্রাণীক মন প্রাণ ও জড়ের ভূমিতে পরিচালিত করিতেছে শুধু তাহাকে জানা যথেষ্ট নহে ; কেননা ইহা হইল অপরা প্রকৃতি এবং যদিও দিব্যজ্ঞান আলোক ও শক্তি সেখানে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং অজ্ঞানের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে, যদিও তাহারা তাহার আবরণ অংশতঃ ছিন্ন করিয়া তাহাদের স্বরূপ প্রকৃতির কিছুটা অভিব্যক্ত করিতে অথবা ঊর্দ্ধ হইতে অবতরণ করিয়া এই সমস্ত অধস্তন ক্রিয়াবলিকে উন্নীত করিতে পারে, তথাপি এমন কি আধ্যাত্মিকভাবে বিভাবিত মন প্রাণ ক্রিয়া ও দৈহিক চেতনাতে পরম একের উপলব্ধি লাভ করিবার পরও আমাদের সক্রিয় প্রত্যঙ্গগুলিতে একটা অপূর্ণতা থাকিয়া যাইতে পারে। তখনও পরাশক্তির ক্রিয়ার প্রতিস্পন্দনে আমাদের মধ্যে ভ্রান্তি ও স্খলন দেখা দিতে, দিব্য পুরুষের মুখের উপর একটা আবরণ থাকিয়া যাইতে, অজ্ঞানের একটা মিশ্রণ নিয়ত বর্ত্তমান থাকিতে পারে। যাহা এই নিম্নতর প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে সেই দিব্য শক্তির নিকট তাহার সত্যের দিকে যখন আমরা নিজেকে খুলিয়া ধরিতে পারিব কেবল তখনই আমরা সেই পরাশক্তির ও পরমজ্ঞানের প্রকৃত পূর্ণ যন্ত্র হইতে সমর্থ হইব।

কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য শুধু মুক্তি নহে, পূর্ণতাও তাহার লক্ষ্য। ভগবান আমাদের প্রকৃতির মধ্য দিয়া আমাদের প্রকৃতির অনুযায়ী ভাবে ক্রিয়া করেন ; যদি আমাদের প্রকৃতি অপূর্ণ হয় তাহা হইলে সে কাজও হইবে অপূর্ণ ও শুদ্ধ ক্রিয়া হইবে না। এমন কি বিষম ভ্রান্তি, অসত্য, নৈতিক দুর্ব্বলতা, অপর্য্যাপ্ত, বিক্ষেপকর প্রভাবরাজির ফলে সে কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইতেও পারে। তখনও আমাদের মধ্যে ভগবানের কাজ চলিবে কিন্তু আমাদের দুর্ব্বলতার অনুযায়ী ভাবে, তাহার মূল উৎসের শক্তি ও বিশুদ্ধির অনুপাতে নহে। আমাদের যোগ যদি পূর্ণ সার্ব্বভৌম যোগ না হইত, আমরা যদি অন্তরাত্মার মুক্তি অথবা প্রকৃতি হইতে পৃথক নিশ্চল পুরুষরূপে স্থিতি শুধু চাহিতাম তাহা হইলে ক্রিয়ার ক্ষেত্রের এই

বা প্রচ্ছন্নভাবে সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়া করিতেছে অথবা বিশ্বের সকল সত্তাকে তাঁহার নিজ সামর্থ্য ব্যবহার করিবার অনুমতি দিতেছে। এই একমাত্র শক্তিই বর্ত্তমান আছে এবং একমাত্র ইহাই ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত ক্রিয়া সম্ভব করিয়া তুলিতেছে। কেননা এই শক্তিই হইল দেহে বল রূপে অধিষ্ঠিত স্বয়ং ভগবান, কর্ম্মশক্তি ভাবনা ও জ্ঞানশক্তি, প্রভুত্ব ও ভোগের শক্তি, প্রেমের শক্তি—সকল শক্তিই সেই এক বস্তু। যিনি নিজেই এই অদ্বয় শক্তিরূপে প্রকাশিত হইতেছেন এবং এই শক্তির মধ্য দিয়া সব কিছু অধিকার ও ভোগ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে বাস করিতেছেন, সকল সত্তা ও সকল ঘটনারূপে সম্ভূত হইয়া উঠিতেছেন, কর্ম্মের সেই প্রভুর সম্বন্ধে সকল বস্তুতে, যেমন নিজেদের তেমনি অপর সকলের মধ্যে সদা সচেতন হইয়া আমরা কর্ম্মযোগের মধ্য দিয়া তাঁহার সঙ্গে দিব্য মিলনে পৌঁছিব এবং কর্ম্মের মধ্যে সেই সার্থকতা দ্বারা অন্যে যাহা পরম ভক্তি বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা লাভ করে তাহার সমস্তই লাভ করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু সম্মুখে উত্তরণের আরও একধাপ আছে যাহা আমাদিগকে ডাক দিতেছে; তাহা হইল বিশ্বের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধ হইতে উপরে উঠিয়া বিশ্বাতীত দিব্যপুরুষের সহিত তাদাত্ম্যলাভ। আমাদের কর্ম্মের ও আমাদের সত্তার প্রভু এখানে এ জগতে শুধু আমাদের অন্তরস্থ পরম দেবতা নহেন, তিনি কেবল বিশ্বপুরুষ বা কোন প্রকার বিশ্বশক্তিও নহেন। এক ধরণের সর্ব্বেশ্বরবাদী (**Pantheist**) আমাদিগকে যে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে জগৎ ও ভগবান এক ও অভিন্ন বস্তু, তাহা সত্য নহে। জগৎ ভগবান হইতে নিঃসৃত এক বস্তু; জগতের মধ্যে যাহা অভিব্যক্ত হইতেছে কিন্তু তাহা দ্বারা সীমিত হয় নাই এমন কিছুর উপরই তাঁহার অস্তিত্ব নির্ভর করে; ভগবান যে কেবল এইখানেই আছেন তাহা নহে; তাঁহার একটা পরাৎপর শাশ্বত বিশ্বাতীত স্থিতিও আছে। আমাদের ব্যষ্টি-সত্তাও তাঁহার আধ্যাত্মিক অংশে বিশ্বসত্তার রূপায়ণ নহে; আমাদের অহমিকা মন প্রাণ ও দেহ তাহা হইতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের অবিনাশী অন্তরাত্মা, অবিকারী পুরুষ আসিয়াছে পরাৎপর তত্ত্ব হইতে।

যিনি আমাদের সত্তার আদি কারণ, আমাদের কর্ম্মাবলির উৎস ও প্রভু তিনি এক পরাৎপর তত্ত্ব, যিনি সমগ্র বিশ্ব ও সমগ্র প্রকৃতির অতীত হইয়াও বিশ্ব ও প্রকৃতিকে অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, যিনি নিজের কিছুটা লইয়া তাহার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং আজিও যাহা হইয়া উঠে নাই সেইরূপে

তাহাকে গঠিত করিতেছেন। কিন্তু বিশ্বাতীত চেতনার আসন ঊর্দ্ধে দিব্য পরমসতের তৎস্বরূপতার মধ্যে অবস্থিত—আবার সেখানেই রহিয়াছে শাশ্বতের পরাশক্তি, চরম সত্য ও পরম আনন্দ ; আমাদের মনন শক্তি যাহার কোন ধারণা করিতে পারে না, আমাদের উচচতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি আধ্যাত্মিকতা বিভাবিত মনে ও হৃদয়ে যাহার শুধু এক খর্ব্ব প্রতিবিম্ব, এক অস্পষ্ট ছায়া, তদুৎপন্ন একটা ক্ষীণ আভাস। আর সেই তৎস্বরূপ হইতে নিয়ত বিচ্ছুরিত হইতেছে আলোক শক্তি আনন্দ ও সত্যের একপ্রকার এক সুবর্ণময় জ্যোতির্মণ্ডল যাহাকে এক অতিমানস এক মহাবিজ্ঞান (gnosis) বলা হয়, প্রাচীন রহস্যবিদ সাধকগণ যাহাকে এক দিব্য ঋতচিৎ বলিতেন যাহার সঙ্গে অবিদ্যা পরিচালিত অধস্তন চৈতন্যময় এই জগতের এক নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, আর এক-মাত্র যাহা এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে এবং যাহার জন্য তাহা বিশ্লিষ্ট ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া এক নির্ঋতি বা মহাবিশৃঙ্খলায় পরিণত হইতেছে না। আজ আমরা যাহাকে বিজ্ঞান (gnosis) বোধি বা ঊর্দ্ধ হইতে উদ্ভাসন বলিয়া তৃপ্ত হই তাহা জ্বলন্ত শিখাবিস্তারী এই পরিপূর্ণ উৎস, এই অতিমানস হইতে আগত ক্ষীণতর কিরণমালা মাত্র ; মানুষের সর্ব্বোচচ বুদ্ধি এবং এই ভাস্বর উৎসের মধ্যে উচচতম মন বা অধিমানসের ক্রমোর্দ্ধগামী নানা স্তর আছে এবং তথায় পৌঁছিবার অথবা তাহার জ্যোতি ও মহিমাকে এখানে নামাইয়া আনিবার পূর্ব্বে আমাদের তাহাদিগকে জয় করিতে হইবে। তথাপি সে আরোহণ, সে বিজয় লাভ যতই দুরূহ হউক না কেন তাহাই মানবাত্মার নিয়তি, আর সেই জ্যোতির্ম্ময় অবতরণ বা দিব্য সত্যকে নামাইয়া আনাই পার্থিব প্রকৃতির কষ্টসাধ্য পরিণতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ; এই উদ্দিষ্ট উত্তরণই পরিণতিধারার অস্তিত্বের কারণ আমাদের প্রগতির চরম অবস্থা এবং আমাদের জাগতিক জীবনের নিগূঢ় মর্ম্ম। কেননা, যদিও পরাৎপর দিব্যবস্তু পুরুষোত্তমরূপে এখানে আমাদের রহস্যময় জীবনের হৃদ্দেশে গোপনে অবস্থিত রহিয়াছেন তথাপি তিনি তাঁহার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবসম্পন্ন বিশ্বব্যাপী যোগমায়ার বহু আবরণ ও ছদ্মবেশে সমাবৃত আছেন ; এই পার্থিব দেহে মানবাত্মার শুধু ঊর্দ্ধারোহণ ও বিজয়লাভের ফলে এই সকল ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িতে এবং সক্রিয় পরম সত্য, সৃষ্টিশীল বিভ্রমের জনক জটপাকানো অর্দ্ধসত্যের এই জাল বিদূরিত করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে ; আর এই অর্দ্ধসত্য এই বিকাশমান জ্ঞান মূলতঃ হইল সেই বস্তু যাহা নিমজ্জিত হইয়া জড়ের নিশ্চেতনাতে পরিণত হইয়াছিল আবার ধীরে ধীরে আংশিকভাবে নিজের দিকে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে এই কার্য্যকরী অবিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পারে ; সে অবস্থা লাভ বা তথায় বাস করিতে হইলে মনের পক্ষে নিজেকে অতিক্রম করিয়া অতিমানসের বিজ্ঞানময় জ্যোতি শক্তি ও ধাতুতে রূপান্তরিত হইতে হইবে। এই নিম্নতর খর্ব্ব চেতনাতে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা সর্ব্বদাই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে ; যথানুক্রমে বা যথাযোগ্য শ্রেণীতে সমাবেশ তখন সম্ভব হইতে পারে কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিগলিত ও পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া যুগপৎ সকলের সার্থকতা সাধিত হইবে না। কোনপ্রকার উচ্চতর সিদ্ধিলাভের জন্য মনের উপরে উঠা একান্ত আবশ্যক। নয়ত চাই এক উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে অথবা তাহার ফলস্বরূপ স্বয়ম্ভূ সত্যের এক সক্রিয় অবতরণ, যে সত্য প্রাণ ও জড়ের অভি-ব্যক্তির পূর্ব্ব হইতেই মনের ঊর্দ্ধে আত্মজ্যোতির মধ্যে শাশ্বতকাল ধরিয়া বর্ত্তমান আছে।

কেননা মনই সদসদাত্মিকা মায়া ; সত্য এবং মিথ্যা সৎ ও অসৎ এই উভয়কে বিজড়িত করিয়া এক ক্ষেত্র আছে, সেই দ্ব্যর্থবোধক ক্ষেত্রে মন যেন রাজত্ব করিতেছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নিজের রাজত্বেও তাহা এক খর্ব্ব চেতনা, শাশ্বত অনন্তের মূল সৃষ্টিশীলা মহাশক্তির অংশ নহে। যদিও মন তাহার সত্তাতে স্বরূপসত্যের কিছুটা প্রতিফলিত করিতে পারে তথাপি তাহার মধ্যে সত্যের সক্রিয় শক্তি ও ক্রিয়া সর্ব্বদাই ভগ্ন ও বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মন বড় জোর বিভক্ত অংশগুলিকে জোড়া দিতে অথবা একটা একত্ব যে আছে তাহা শুধু অনুমান করিতে পারে ; মনের সত্য একটা অর্দ্ধসত্যমাত্র অথবা তাহা একটা হেঁয়ালী বা ধাঁধার অংশ। মানস জ্ঞান সর্ব্বদাই আংশিক ও আপেক্ষিক, কোন নিশ্চয় সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার শক্তি তাহার নাই, তাহার বহির্গমনশীল ক্রিয়া ও সৃষ্টির পথে পদে পদে তাহা আরও অধিক বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে অথবা শুধু সংকীর্ণ সীমার মধ্যে অপূর্ণভাবে জোড়াতালি দিয়া সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট কিছুতে পৌঁছে। এই ক্ষীণতর চেতনার মধ্যেও মনোময় আত্মারূপে ভগবান ব্যক্ত হন, যেমন তিনি প্রাণে প্রাণময় আত্মারূপে বিচরণ করেন অথবা যেমন জড়ে আরও অস্পষ্টভাবে অন্নময় আত্মারূপে বাস করেন ; কিন্তু এখানে তাঁহার পরিপূর্ণ সক্রিয় প্রকাশ হয় না, এখানে শাশ্বতের পূর্ণ তাদাত্ম্য-জ্ঞানরাজি জাগে না। যখন আমরা সীমারেখা পার হইয়া যেখানে দিব্যসত্য আগন্তুক নয় আপন জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত সেই বৃহত্তর জ্যোতির্ম্ময় চেতনা ও আত্ম-সচেতন সদ্‌বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিব কেবল তখনই তাঁহার সত্তায়, শক্তি ও ক্রিয়াধারায় অবিনাশী পূর্ণাঙ্গ সত্যের মধ্যে আমাদের সত্তার প্রভু আমাদের কাছে প্রকাশিত হইবেন। আর কেবল সেখানেই

আমাদের মধ্যে তাঁহার কর্ম্মরাজি তাঁহার অব্যর্থ অতিমানস লক্ষ্যের নিখুঁত গতিধারা হইয়া দাঁড়াইবে।

কিন্তু ইহা তো হইল এক দীর্ঘ ও দুরূহ অভিযানের শেষ কথা ; তবে কর্ম্মের প্রভু যোগপথারূঢ় সাধকের সহিত মিলিত হইতে এবং তাঁহার গোপন অথবা অর্দ্ধপ্রকট হস্ত তাহার এবং তাহার অন্তরজীবন ও কর্ম্মের উপর স্থাপিত করিতে ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন না। নিশ্চেতনার ঘন আবরণের অন্তরালে, প্রাণশক্তির মধ্যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া প্রতীক দেবতা ও মূর্ত্তির মধ্য দিয়া মনের নিকট পরিদৃশ্যমান হইয়া তিনি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও গ্রহীতা-রূপে পূর্ব্ব হইতেই জগতের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। এরূপ হইতে পারে যে এই সমস্ত ছদ্মবেশ ধরিয়াই পূর্ণাঙ্গ যোগপন্থার জন্য নির্দ্দিষ্ট অন্তরাত্মার সহিত তিনি প্রথমে সম্মিলিত হন। অথবা এমন কি আরও দুর্ভেদ্য মুখোশে নিজেকে আবৃত করিয়া তিনি আমাদের কল্পনার পথে এক আদর্শরূপে উদিত হইতে পারেন অথবা আমাদের মনের কাছে প্রেম, মঙ্গল, সৌন্দর্য্য বা জ্ঞানের বস্তু-নিরপেক্ষ এক শক্তিরূপে দেখা দিতে পারেন ; আবার ইহাও হইতে পারে যে যখন আমরা যোগপথের দিকে ফিরি তখন মহামানবের ছদ্মবেশে অথবা সব কিছুর অভ্যন্তরস্থিত যে সংকল্প জগৎকে অন্ধকার, মিথ্যা, মৃত্যু ও দুঃখ, অজ্ঞানের এই চতুষ্পাদের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে সেই সংকল্পের প্রচ্ছন্নরূপে আমাদের নিকট আসিতে পারেন। তাহারপর, যখন আমরা পথে প্রবিষ্ট হইয়াছি তিনি তাঁহার বিরাট শক্তিমান ও মুক্তিপ্রদ নৈর্ব্ব্যক্তিকতা দ্বারা আমাদিগকে পরিবেষ্টন করেন অথবা ব্যক্তিরূপী ভগবানের আকার ও বিগ্রহ লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। আমাদের অন্তরে ও বাহিরে চতুর্দ্দিকে আমরা অনুভব করি যে এক শক্তি আমাদিগকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতেছে, রক্ষা করিতেছে, পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে ; আমরা শুনিতে পাই এক বানী যাহা আমাদের পথ দেখাইতেছে ; বুঝিতে পারি আমা-দের অপেক্ষা বৃহত্তর এক চেতন-সংকল্প আমাদিগকে শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ; এক অলঙ্ঘনীয় শক্তি আমাদের ভাবনা কর্ম্ম এমন কি আমাদের দেহ পর্য্যন্ত পরিচালিত করিতেছে ; এক নিত্যবর্দ্ধমান মহাচৈতন্য আমাদিগকে আত্মসাৎ করিতেছে, একটা জীবন্ত জ্ঞানের জ্যোতি আমাদের অন্তরের সব কিছুকে উদ্ভাসিত করিতেছে অথবা এক পরম আনন্দ আমাদিগকে

পূর্ণস্বচ্ছ দিব্য অভিব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। ব্যষ্টিচেতনা তাহার যথার্থ বোধ ও ক্রিয়া পুনঃপ্রাপ্ত হইবে ; কেননা সে চেতনা পরম পুরুষের মধ্য হইতে বিনির্গত অন্তরাত্মার এক রূপ এবং বর্ত্তমান প্রতীয়মান অবস্থা সত্ত্বেও তাহা এক মূল কেন্দ্র বা নীহারিকা (**nucleus or nebula**) যাহার মধ্যে কালের ক্ষেত্রে জড়ের মধ্যে দিব্য অকাল ও অরূপ ভগবানকে বিজয়ীরূপে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার জন্য দিব্য মাতৃশক্তি ক্রিয়া করিতেছে। আমাদের দৃষ্টি ও অনুভূতিতে কর্ম্মের প্রভুব সংকল্প এবং সকল কর্ম্মের চরম তাৎপর্য্যরূপে ইহাই ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিবে আর একমাত্র ইহাই বিশ্ববিসৃষ্টিকে এবং জগতে আমাদের নিজের কর্ম্মকে এক আলোক ও অর্থ-দান করে। ইহার উপলব্ধি এবং কার্য্যতঃ সেজন্য চেষ্টা করাই পূর্ণযোগে দিব্য কর্ম্মমার্গের সমগ্র গানের ধূয়া, সমগ্র মূলবস্তু।

বা সুখের দ্বারা স্থির হয় না। যে কাজ পরম সত্যের সহিত সুসমঞ্জস অথবা ভগবান তাহার প্রকৃতির মধ্য দিয়া যে কাজ করিতে বা করাইতে চান সর্ব্বদা সে শুধু তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহা হইতে লোকে কোন কোন সময় একটা ভুল সিদ্ধান্ত করে যে আধ্যাত্মিক মানুষ ঈশ্বর বা নিয়তি দ্বারা কিম্বা পূর্ব্ব কর্ম্মবশে জীবনের যে ক্ষেত্রে স্থাপিত, জন্ম অথবা ঘটনার দ্বারা যে পরিবার, সম্প্রদায়, বর্ণ, জাতি ও বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে, তাহাদিগকে অতিক্রম অথবা বৃহৎ কোন পার্থিব লক্ষ্যের অনুসরণ করিবে না এমন কি হয়ত সেদিকে কোন চেষ্টা করাও তাহার পক্ষে উচিত হইবে না। যখন প্রকৃতপক্ষে তাহার করণীয় কোন কর্ম্ম নাই, যখন তাহার কাছে কর্ম্মের ব্যবহার—তা যে কর্ম্মই হউক না কেন,—রহিয়াছে শুধু ততদিন যতদিন সে মুক্তিলাভের জন্য দেহের মধ্যে আছে, আর মুক্তি অধিগত হইলে যখন তাহার কর্ম্ম হইল পরম পুরুষের সংকল্প শুধু মানিয়া চলা এবং তিনি যাহা আদেশ করেন তাহা পালন করা, তখন প্রকৃতপক্ষে যে ক্ষেত্র তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। একবার মুক্ত হইলে, নিয়তি ও ঘটনাবশে তাহার জন্য যে ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহাকে তন্মধ্যে থাকিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে, যতদিন সেই পরম মুহূর্ত্ত না আসে যখন সে অনন্তের মধ্যে অবশেষে বিলীন হইয়া যাইতে পারিবে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের বা কোন বৃহৎ পার্থিব লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য চেষ্টা করা অর্থ কর্ম্মের ভ্রান্তিতে পতিত হওয়া, এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা যে পার্থিব জীবনের বোধগম্য কোন লক্ষ্য আছে তাহার মধ্যে অনুধাবনযোগ্য কোন বস্তু আছে। এরূপ সিদ্ধান্তে আমাদের সম্মুখে বৃহৎ সেই মায়াবাদ পুনরায় আসিয়া দাঁড়ায় যাহা কার্য্যতঃ জগতের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্বের এক অস্বীকৃতি, অস্বীকৃতি তখনও যখন শুধু ধারণায় তাহার অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু ভগবান এখানে, এই জগতেই রহিয়াছেন, শুধু নিশ্চল স্থিতিরূপে নয় কিন্তু গতিরূপেও, শুধু আধ্যাত্মিক সত্তা ও অধিষ্ঠানরূপে নয় কিন্তু শক্তি, বীর্য্য ও তেজরূপেও—তাই এজগতে দিব্যকর্ম্ম সম্ভবপর।

কর্ম্মযোগীর উপর তাহার বিধানরূপে কোন সংকীর্ণ তত্ত্ব, তাহার কার্য্য-ক্ষেত্ররূপে কোন সীমাবদ্ধ কর্ম্ম আরোপ করা যায় না। এই পর্য্যন্ত সত্য যে মুক্তি বা আত্মনিয়ন্ত্রণের দিকে অগ্রসর হইবার পথে মানুষের কল্পনায় ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, প্রয়োগে সংকীর্ণ হউক বা উদার হউক, প্রত্যেক প্রকার কর্ম্মই সমানভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার এ পর্য্যন্তও সত্য যে মুক্তির

কর্ম্ম বাহ্য বস্তু, অন্তরাত্মার কোন উপাদান নহে এবং এই পথে তাহা চরম আদর্শ হইতে পারে না। সৈনিকের কর্ত্তব্য ডাক পড়িলে যুদ্ধ করা, এমন কি প্রয়োজন হইলে নিজের বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের উপর গুলি বর্ষণ করা; কিন্তু এই ভাবের অথবা ইহার অনুরূপ কোন আদর্শ যোগসিদ্ধ পুরুষের উপর চাপাইয়া দেওয়া যায়না। অপর পক্ষে হৃদয়ে প্রেম ও করুণা পোষণ করা আমাদের সত্তার উচ্চতম সত্যের নির্দ্দেশ মানিয়া চলা, ভগবানের আদেশ পালন করা এ সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে; প্রকৃতি যখন ভগবানের দিকে উঠিয়া যাইতেছে এগুলি তখন সেই প্রকৃতির বিধান, অধ্যাত্ম অবস্থা হইতে প্রবহমান কর্ম্ম, আত্মার পরম সত্য। মুক্ত কর্ম্মীর কর্ম্ম হইবে অন্তরাত্মা হইতে নিঃসৃত তেমনি এক প্রবাহ; ভগবানের সঙ্গে তাহার আধ্যাত্মিক মিলনের স্বাভাবিক ফলেই এ স্রোত তাহার নিকট বা তাহার মধ্য হইতে আসিবে; মানস ভাবনা ও সংকল্প, বাস্তব ক্ষেত্রের যুক্তি বিচার অথবা সামাজিক বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নৈতিক উন্নতি বিধায়ক কোন গঠিত বস্তু হইতে সে প্রবাহ উৎপন্ন হইবে না। সাধারণ জীবনে ব্যক্তি সমাজ বা ঐতিহ্যগত বাঁধাধরা নিয়ম, মান বা আদর্শই মানুষকে পরিচালিত করে; কিন্তু একবার অধ্যাত্ম পথে যাত্রা আরম্ভ হইলে তাহার স্থানে আসিয়া পড়িবে এক আন্তর ও বাহ্য বিধান অথবা এক জীবনধারা যাহা আমাদের আত্মনিয়মন মুক্তি ও সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন—এমন এক জীবনধারা যাহা আমরা যে পথ অনুসরণ করিতেছি তাহার পক্ষে উপযুক্ত অথবা যাহা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচালক প্রভু বা গুরুর দ্বারা নির্দ্ধারিত অথবা যাহা আমাদের অন্তরের দিব্য দিশারীর দ্বারা আদিষ্ট। কিন্তু অন্তরাত্মার আনন্ত্য ও মোক্ষের চরম অবস্থায় সকল বাহ্য আদর্শ বর্জিত হয় এবং তাহার স্থানে অবশিষ্ট থাকে শুধু আমাদের সহিত অখণ্ড মিলনে মিলিত ভগবানের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও সর্ব্বাঙ্গীণ এক আজ্ঞাধীনতা এবং এমন এক কর্ম্মধারা যাহা আমাদের সত্তা ও প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ আধ্যাত্মিক সত্য আপনা হইতেই সার্থক করিয়া তোলে।

স্বভাব দ্বারা নির্দ্ধারিত ও পরিচালিত কার্য্যই হইবে আমাদের কর্ম্মের বিধান, গীতার এই নির্দ্দেশকে উপরিউক্ত গভীরতর অর্থেই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই স্বভাব নিশ্চয়ই মানুষের বাহ্য মেজাজ বা চরিত্র বা

অভ্যাসগত প্রণোদনা অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই কিন্তু সংস্কৃত 'স্ব-ভাব' শব্দের আক্ষরিক অর্থে যাহা বুঝায় গীতা সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছে—এ শব্দ দ্বারা নিজের স্বরূপ প্রকৃতি আমাদের অন্তরাত্মার দিব্য উপাদানকে বুঝিয়াছে। এই মূল হইতে যাহা কিছু জাত হয় এই উৎস হইতে যাহা কিছু প্রবাহিত হয় তাহা গভীর, সারভূত, যথার্থ বস্তু,—বাকী সব মতামত আবেগ অভ্যাস কামনা, কেবল সত্তার বহিস্তরের রূপায়ণ বা তাহার ক্ষণিক খেয়াল অথবা এরূপও হইতে পারে যে তাহা বাহির হইতে আগত বা আরোপিত বস্তু। ইহাদের স্থান ও রূপ পরিবর্ত্তিত হয় কিন্তু এই মূল তত্ত্ব যেমনকার তেমনিই থাকে। আমাদের মধ্যে প্রকৃতি কার্য্যসাধনের জন্য যে রূপ পরিগ্রহ করে আমরা তাহা নহি অথবা তাহা আমাদের নিত্য শাশ্বত এবং যথার্থ প্রতিরূপ-প্রদর্শক মূর্ত্তি নয়; আমাদের যথার্থ স্বরূপ হইল আমাদের অন্তরস্থ অধ্যাত্ম সত্তা—আর আমাদের অন্তরাত্মারূপে যে সম্ভূতি তাহা এই সত্তার অন্তর্গত—ইহা বিশ্বে নিত্যকাল ধরিয়া বর্ত্তমান আছে।

অবশ্য আমাদের সত্তায় এই প্রকৃত আন্তর বিধানকে আমরা সহজে পৃথক করিয়া দেখিতে পারি না; যতদিন আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধি অহমিকার কালিমা হইতে মুক্ত না হইতেছে ততদিন এ বিধানকে আবরণের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রাখা হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বাহ্য ও ক্ষণিক ধারণা আবেগ বাসনা এবং পরিবেশ হইতে আগত সকল প্রকার ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া চলি; অথবা আমাদের অনিত্য মনপ্রাণদেহগত ব্যক্তিত্বের নানা মূর্ত্তি পরিস্ফুট করিয়া তুলি—যে ব্যক্তিত্ব কৃত্রিম, অনুভব বা পরীক্ষামূলক, চলমান ও রচিত এক সত্তা, আমাদের সত্তা ও নিম্নতর বিশ্বপ্রকৃতির চাপের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে। যে পরিমাণে আমরা পরিশোধিত হইতে থাকিব সেই পরিমাণে আমাদের খাঁটি অন্তরপুরুষ নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রকট করিবে; আর তত অল্প পরিমাণে আমাদের সংকল্প বহিরাগত ঈঙ্গিত ও নির্দ্দেশের মধ্যে বিজড়িত অথবা আমাদের নিজেদের বাহ্য মনের রূপায়নে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। অহমিকা বর্জিত হইলে স্বভাবের বিশুদ্ধি আসিলে কর্ম্ম আসিবে অন্তরাত্মার নির্দ্দেশ হইতে, চিৎপুরুষের গভীরতা ও সমুন্নত শিখর প্রদেশ হইতে; অথবা আমাদের কর্ম্মধারা প্রকাশ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে ভগবানের দ্বারা যিনি চিরদিন আমাদের হৃদয়ের অন্তরে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছেন। যোগীর প্রতি গীতার চরম ও পরম বাণী এই যে তাহাকে বিশ্বাস ও ক্রিয়ায় সকল প্রকার প্রথাসম্মত রীতিনীতি, আচরণের সকল প্রকার নির্দ্ধারিত বাহ্য নিয়ম, বাহিরের বহিশ্চর প্রকৃতির

ত্রয়োদশ অধ্যায়*

অতিমানস এবং কর্ম্মযোগ

এক উচচতর আধ্যাত্মিক চেতনায় এবং এক বৃহত্তর দিব্য জীবনে অখণ্ড সত্তার আমূল পরিবর্ত্তন পূর্ণযোগের সমগ্র এবং চরম লক্ষ্যের একটি অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য্য অঙ্গ। অবশ্যরূপে ইহা চাই যে আমাদের সংকল্প এবং কর্ম্মের সকল অংশ, আমাদের জ্ঞানের সকল অঙ্গ, আমাদের চিন্তাশীল আবেগময় ও প্রাণময় সত্তা, আমাদের সমগ্র আত্মা এবং প্রকৃতি, ভগবানকেই খুঁজিবে, অনন্তের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং নিত্যবস্তুর সহিত মিলিত হইবে। কিন্তু মানুষের বর্ত্তমান প্রকৃতি সীমিত, বিভক্ত এবং সমতাশূন্য—তাহার যে অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী একাগ্রচিত্তে তাহাতে অভিনিবিষ্ট হওয়া এবং নিজ প্রকৃতির উপযোগী কোন নির্দ্দিষ্ট প্রগতির ধারা অনুসরণ করিয়া চলা তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ; অতি কদাচিৎ দু এক জন এরূপ শক্তিশালী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যিনি একেবারে সোজাসুজি দিব্য অনন্তের সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে সমর্থ। সেইজন্য কাহারও কাহারও পক্ষে নিজেদের মধ্যে আত্মার শাশ্বত সত্যকে আবিষ্কার করিবার জন্য যাত্রারম্ভের আদি বিন্দু-রূপে ভাবনায় অভিনিবেশ বা ধ্যান অথবা মনের একাগ্রতাসাধনকে বাছিয়া নেওয়া আবশ্যক ; অন্য কেহ কেহ অধিকতর সহজভাবে হৃদয়ে নিজেকে প্রত্যাহৃত করিয়া লইয়া তথায় শাশ্বত দিব্যপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন ; আবার অন্য কেহ কেহ আছেন যাহাদের মধ্যে গতি এবং ক্রিয়ার খেলাই প্রবল, এই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে ইচ্ছাশক্তিতে নিজেদিগকে কেন্দ্রীভূত করিয়া কর্ম্মের মধ্য দিয়া নিজ সত্তার প্রসারতাসাধন করাই সর্ব্বোত্তম পন্থা। যিনি পরমাত্মা এবং সব কিছুর উৎস, তাহার আনন্ত্যে সর্ব্ব সংকল্প সমর্পণ দ্বারা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, সকল কর্ম্মে অন্তরস্থিত গোপন দিব্যপুরুষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া অথবা যিনি সকল বিশ্ব কর্ম্মের অধীশ্বর, ভাবনা অনুভূতি ও ক্রিয়ার

* গ্রন্থকার যে কার্য্যের আরও বিস্তারসাধন করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ করিয়া যান নাই এ অধ্যায়টি তাহার এক অংশ।

সকল শক্তির প্রভু ও নিয়ন্তারূপে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া সত্তার এই প্রসারতা দ্বারা অহংশূন্য এবং সার্ব্বভৌম হইয়া কর্ম্ম দ্বারা সাধক আধ্যাত্মিক স্থিতির এক প্রাথমিক পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারে। কিন্তু যাত্রারম্ভ যে বিন্দু হইতেই হউক না কেন প্রত্যেকের পথকে উন্মুক্ত স্থানে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক বিশালতর রাজ্যে পৌঁছিতে হইবে ; অবশেষে তাহাকে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, ভাবাবেগ ও সক্রিয় কর্ম্ম সংকল্পের এক সমগ্রতার, সত্তা ও সমস্ত প্রকৃতির পূর্ণতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেই হইবে। অতিমানস চেতনায়, অতিমানস জীবনে এই পূর্ণাঙ্গ সাধনা চরম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় ; তথায় জ্ঞান, সংকল্প, ভাবাবেগ, আত্মা ও সক্রিয় প্রকৃতির পূর্ণতা ইহাদের প্রত্যেকে তাহার নিজস্ব চরম অবস্থায় উন্নীত হয়, সকলই পরস্পরের সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যে স্থাপিত, মিলিত এবং মিশ্রিত হয়, এক দিব্য পরিপূর্ণতা এবং এক দিব্য পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছে। কেননা অতিমানস হইল এক ঋতচিৎ বা সত্যচেতনা, যাহার মধ্যে দিব্য সত্য পূর্ণ প্রকাশিত ; অবিদ্যাকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া তাহাকে আর কার্য্য করিতে হয় না ; অতিমানস, সত্তার স্থিতির এক চরম সত্য, আবার যে সত্তা স্বয়ম্ভূ এবং পূর্ণ, তাহার শক্তি এবং ক্রিয়ার সত্যের মধ্যে তাহা সক্রিয় হয়। তাহার প্রত্যেক গতিবৃত্তি দিব্যপুরুষের স্বয়ংপ্রজ্ঞ সত্যের গতিবৃত্তি, প্রত্যেক অংশ সমগ্রের সহিত পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে বিধৃত। এমন কি এই সত্যচেতনাতে অতি সীমাবদ্ধ এবং সান্ত ক্রিয়াও শাশ্বত ও অনন্তেরই একটা গতি এবং শাশ্বত ও অনন্তের মধ্যে নিত্য অনুস্যূত চরম ও পরম পূর্ণতারই অংশভাগী। অতিমানস সত্যে উত্তরণ যে কেবল আমাদের চিন্ময় এবং মৌলিক চেতনাকে সেই ঊর্দ্ধভূমিতে উত্তীর্ণ করে তাহা নয়—কিন্তু আমাদের সমগ্র সত্তায়, প্রকৃতির সকল অংশে সেই আলোক এবং সত্যকে নামাইয়া আনে। সব কিছু তখন দিব্য সত্যের অংশে পরিণত হয়, সেই পরম মিলন এবং একত্বলাভের উপাদান ও উপায় হইয়া উঠে ; সুতরাং এই আরোহণ এবং অবরোহনকে যোগের এক চরম উদ্দেশ্য হইতেই হইবে।

আমাদের সত্তার এবং সর্ব্বসত্তার দিব্য সত্যের সঙ্গে মিলনই যোগের একমাত্র মৌলিক উদ্দেশ্য, এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে অতিমানসকেই লাভ করিবার জন্যে আমরা যোগের পথ গ্রহণ করি নাই, ভগবানের জন্যই যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; অতিমানসের নিজস্ব আনন্দ এবং পূর্ণতার জন্য আমরা তাহাকে খুঁজিনা, আমরা চাই ভগবানের সহিত মিলনকে পূর্ণ ও চরম করিয়া তুলিতে, চাই সে মিলনকে লাভ ও অনুভব করিয়া সম্ভবপর সকল উপায়ে আমাদের সত্তার সর্ব্বত্র, তাহার উচ্চতম

STATE CENTRAL
VIP Road. C

সংশোধন

নির্ভুল করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থমধ্যে কিছু কিছু ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। ছাপাইবার সময় কোন কোন অক্ষরের নীচের উপরের বা পার্শ্বের চিহ্ন—যথা আকার ইকার উকার ঋকার রেফ প্রভৃতি—কখন কখন ভাঙিয়া গিয়াছে। দুএকস্থানে বানানভুলও রহিয়াছে। যেস্থানে বুঝিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইবে না মনে করিয়াছি সেখানে ভুল সংশোধনে তাহা ধরা হয় নাই। যে কয়েকটি গুরুতর ভুল চোখে পড়িয়াছে অথবা যেখানে বুঝিতে কষ্ট হইবে মনে হইয়াছে এই সংশোধনপত্রে শুধু তাহাই দেওয়া হইল।

পৃষ্ঠা	ছত্র	যাহা আছে	যাহা হইবে
৩৮	১৫	অজন	অর্জন
,,	২৫	প্রদেশ কম	প্রদেশে কর্ম্ম
৪৬	১৪	কি যাহা	কি, যাহা
৫৮	২	অবেশষে	অবশেষে
৬১	২৫	যে	সে
৭৬	১৫	সর্ব্বান্তকঃরণে	সর্ব্বান্তঃকরণে
,,	১৫	প্রবত্ত	প্রবৃত্ত
১১৭	৩০	আম্রা	আম্রা
১২৭	১০	ব্যক্ত পুরুষ	ব্যক্তিপুরুষ
১৩৬	১৪	বিশ্রপ্রাণ	বিশ্বপ্রাণ
২০৪	৫	কিন্দ্র	কিন্তু
২১৬	২৫	ব্যক্তিসসত্তার	ব্যক্তিসত্তার
২২৭	৭	যে	সে
২৩৪	৩	তাহার কর্ম্মাবলিকে	তাহার বাহ্য কর্ম্মাবলিকে
২৪৬	১২	অস্বীকারে	অস্বীকার
২৬৭	৪	পাওয়া যাহাতে	পাওয়া যায় যাহাতে
২৮৮	৬	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যে
৩১৬	২৫	মধ্যের	মধ্যে